মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে তত্ত্বভাবনা

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকগণ যখন নতুন চিন্তা ভাবনায় বাংলা সাহিত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট প্রয়াস করছেন এরকম এক ক্রান্তিকালে অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশালে মোহিত চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্ত লালসায় মত্ত সমগ্র বিশ্বের ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর পিশাচরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা সারা বিশ্বের পরিবেশকে কলুষিত করে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সকল পরাধীন দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের অদম্য স্পৃহায়। কিছু কিছু দেশ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি আপাত স্বাধীনতা লাভ করে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলিদানের বিনিময়ে। ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা ও বিশ্বাস। যার ফলে মানুষ হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ, একাকী। মানুষের অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছিল। রক্তক্ষয়ী সর্বনাশা বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েও মানুষ ও মানবসমাজকে বাধ্য করে দিয়েছিল বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নিযুক্ত থাকতে। আত্মীয়-স্বজন হারা সঙ্গীহীন নিঃসঙ্গ মানুষগুলি যন্ত্রণাকাতর মহাজীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বিসহ অবস্থাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকগণ। তাঁরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন মানুষের জীবনসংগ্রামের সমগ্র চিত্রকে একই তুলির টানে ফুটিয়ে তুলতে। তাঁরা খুঁজেছিলেন এমন এক শৈল্পিক রীতি যার মাধ্যমে মানুষের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চেতন ও অবচেতন স্তরের সকল রহস্য দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাহিত্য তত্ত্বের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে। অ্যাবসার্ড সাহিত্যতত্ত্বও এমনই এক শিল্পরীতি যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানসচিত্তের সমগ্র চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। তবে এ ক্ষেত্রে বলে

রাখা প্রয়োজন যে, অ্যাবসার্ড তত্ত্ব কোন সাহিত্য আন্দোলন প্রসূত ফসল নয়। এক্ষেত্রে প্রথমে অ্যাবসার্ড তত্ত্বের সৃষ্টি; পরে এই তত্ত্ব কেন্দ্রিক অ্যাবসার্ড দর্শন ও সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রত্যক্ষ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ঘটে যাওয়া মন্বন্তর, খাদ্য সংকট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশবিভাগ, বেকার সমস্যা ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক-সামাজিক–রাজনৈতিক শোষণ প্রভৃতি অস্থির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল অ্যাবসার্ড নাটকের পটভূমি তৈরিতে বিশেষ সহায়তা করেছিল। তার পাশাপাশি পরীক্ষামূলক পাশ্চাত্য নাট্য আন্দোলনের অভিঘাত বাংলায় অ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিশ্ব নাট্যজগতে যখন এই ধারার নাটক প্রধান আলোচ্য বিষয়, সেই দেশকালের প্রেক্ষাপটে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটককার হিসেবে বাংলা নাট্য জগতে আবির্ভাব ঘটে। "মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক: জীবন ও শিল্প" বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণতার জন্য তাঁর নাটকে প্রযুক্ত তত্ত্ব ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস রইল এই অধ্যায়ে।

জীবনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য মানুষ শিল্পের কাছে যায়। বাস্তবকে সরাসরি উপলব্ধি করার জন্য শিল্প নিজস্ব উপায় অবলম্বন করে। শিল্পের সঙ্গে তত্ত্বের কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিল্পী জীবনের বাস্তবতাকে শিল্পের মাধ্যমে ধরতে গিয়ে নিজের অজান্তে তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় যথার্থ শিল্পীসত্তাকে অনুসন্ধান করতে কাব্য কবিতায় কালক্ষেপণ না করে নাটক রচনায় ব্যাপৃত হন। যুদ্ধবিধ্বস্ত, মৃত্যু, নৈরাশ্যপীড়িত, হতাশাব্যঞ্জক অস্তিত্ব সংকটাপন্ন মানব সমাজ ও মানবজীবনকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি এমন এক শিল্পমাধ্যমের সন্ধান করেছিলেন যা প্রথাগত রীতিসর্বস্ব নিয়মানুগ নাটক থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তিনি পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন বাস্তবধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে মানবতার সার্বিক প্রকাশ সম্ভব নয়। সাধারণত রিয়ালিস্টিক নাটকে মানবজীবনকে বর্তমান কালের প্রেক্ষিতে বিচার করার পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের জীবন

কেবল কোন একটা কালে নয়, তা তিন কালেই (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ) আবর্তিত। মানবজীবনে কোনো 'ফিক্সড টাইম এ্যান্ড স্পেস' নেই। তাই তিনি এই 'ফিক্সড টাইম এ্যান্ড স্পেস'র নিয়ম ভাঙার অর্থাৎ ননরিয়ালিস্টিক বা বাস্তবতাবর্জিত নাটক রচনার প্রচেষ্টা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটককার হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে গন্ধর্ব পত্রিকা শারদ সংখ্যায় প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' প্রকাশিত হওয়ার নাট্যজগতে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়। হতচকিত সবাই ভাবতে শুরু করেন এ কেমন ধারার নাটক। শুরু হয় নানা আলোচনা-সমালোচনার। তাঁর নাটকের তত্ত্বালোচনা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত আজও থেমে থাকেনি। নাট্য গবেষক ড. পবিত্র সরকার তাঁর 'নাটমঞ্চ নাট্যকথা' গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নাটক বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে –'আখ্যান গঠনের দিক থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে অ্যাবসার্ড তত্ত্বদর্শনের আংশিক সূত্র গ্রহণের কথা বলেছেন'। এই অ্যাবসার্ড দর্শনের সৃষ্টি মাত্র দুই দশকের মধ্যে ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত সমাজ জীবন ও মানব জীবনে নৈরাশ্য, হতাশা, অনিশ্চয়তা, বিচ্ছিন্নতা মৃত্যু থেকে। প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে দুই বিশ্বযুদ্ধের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ষাটের দশকের শুরুতেই অ্যাবসার্ড নাটকের সূত্রপাত। ১৯৫২ সালে স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো' (Wating for Godot) বিশ্বনাটকের দরবারে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যা প্রচলিত প্রথাগত নাটকের ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রথার এক অভিনব নাট্য রীতি। যদিও প্রথমে এই অ্যাবসার্ড ধারাকে গ্রহণ করতে পারেনি মানুষ, অনেক সময় লেগেছিল আত্মস্থ করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি মানুষের জীবনকে অনিশ্চয় উদ্ভট করে তুলেছিল। এই অদ্ভুত জীবন কথা তুলে ধরার উপযোগী উদ্ভট নাট্যদলের ভাবাদর্শ সম্পর্কে অবগত হতে গেলে

অ্যাবসার্ড নাটকের সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও পূর্বাপর ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন।

অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটকের সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে নাটক সুসংহত নিয়মবদ্ধ, যাকে পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে 'ওয়েল মেড প্লে' তারই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম ফসল হল অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাটক। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, অভিনয় ইত্যাদি সমস্ত বিভাগেই স্বতন্ত্র দুরধিগম্য, মহাযুদ্ধোত্তর জীবনদর্শন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার এক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞান প্রতিফলিত হয় এই রীতির নাটকে।

'Absurd' শব্দটি মূল ল্যাটিন শব্দ 'Absurdus' থেকে উদ্ভূত। 'Ab' এর অর্থ 'form' এবং 'surdus' এর অর্থ হল deaf, inaudible, dull. 'Absurdus' কথাটির অর্থ হল out of fashion. 'Absurd' এর অর্থ wildly unreasonable, illogical, inappropriate, incongruent. প্রচলিত ইংরেজি- বাংলা অভিধান গুলিতে 'absurd' এর অর্থ করা হয়েছে – অসামঞ্জস্য, প্রথা বহির্ভূত, অযৌক্তিক, কিম্ভুতকিমাকার, অদ্ভুত। বাংলায় ' Absurd Drama'র সেই অর্থে কোনো পরিভাষা নেই। 'Absurd Dramar'র পরিভাষা হিসেবে 'কিমিতি' (কিম্ + ইতি = ইহা কি? What is it?) শব্দটি গ্রহণ করা হলেও তেমন ভাবে বহু প্রচলিত নয়, যতটা 'অ্যাবসার্ড নাটক' শব্দটি বাংলায় প্রচলিত। [১]

দি সর্টার ইংলিশ ডিকশনারি (১৯৬৫) অনুযায়ী Absurd কথাটির অর্থ ' Absurd: 1. mus Inharmonious.1617, 2. Out of harmony with reason or propriety; mod.use, plainly opposed to reason, and hence ridiculous, silly.1557' [২]

নাটকের ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্টিন এসলিন ১৯৬১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড' (The Theatre of The Absurd) গ্রন্থে। আলবেয়ার কামু (Albert Camus) তাঁর 'দ্য মিথ অফ সিসিফাস' (The Myth of Sisyphus) গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিকারগ্রস্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিত বোঝাতে গিয়ে পুরাণের সিসিফাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তিনি প্রথম অ্যাবসার্ড শব্দের প্রয়োগ করেন– "A world that can be explained by reasoning however faulty, it is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feels a stranger. He is an irremediable exile, because he is deprived of memories of a lost homeland as much as he lackes the hope of a promised land to come. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitutes the feeling of Absurdity." [৩]

মার্টিন এসলিন উদ্ভট নাটকের সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'The Myth of Sisyphus' গ্রন্থের গুরুত্বের কথা প্রসঙ্গে বলেছেন–

" ... medieval beliefs still held and overlaid by eighteenth-century rationalism and mid-nineteenth-century Marxism, rocked bu sudden volcanic eruption of prehistoric fanaticism and primitive tribal cults. Each of these components of the cultural pattern of the age finds its own artistic expression. Theatre of the Absurd, however, can be seen the reflection of what seems to be the attitude most genuinely representative of our own time. ... The declinge of religious faith

was masked until the end of the Second World War by the substitute religious of faith in progress, nationalism and various to totalitarian fallacies. All this was shattered by the war. By 1942 Albert Camus was clamly putting the question why, since life had lost all meaning, man should not seek escape in suicide. In one of the great, seminal heart-searchings of our time, The Myth of Sisyphus, Camus tried to diagnose the human situation in a world of Shattered beliefs."[৪]

মূলত পঞ্চাশের দশকে ইউরোপে উদ্ভূত এক ধরণের অদ্ভুত নাটককে 'উদ্ভট নাটক বা অ্যাবসার্ড নাটক' বলে চিহ্নিত করেছেন সমালোচকগণ। মার্টিন এসলিন তাঁর বিখ্যাত 'থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড' (Theatre of The Absurd) গ্রন্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত এক ধরণের অভিনব অদ্ভুত নাটককে 'থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড' (Theatre of The Absurd) বলে চিহ্নিত করেছেন। নাটকের অ্যাবসার্ড দার্শনিক ধারণার প্রয়োগ সম্পর্কে এসলিনের সচেতনতাকে এ. পি. হিংক্লিফ তাঁর 'দি অ্যাবসার্ড'(The Absurd) বইয়ে লিখেছেন—"This particular application of current philosophical term to drama was the invention of Martin Esslin in his book The Theatre of The Absurd (1961), and since this book more than anything else has made the term familiar to English reading public, it seems reasonable to begin a decision of Absurdity in this context."[৫]

জন রাসেল টেলর 'The Penguin Dictionary of Theatre' গ্রন্থে বলেছেন— আমাদের সমস্ত কাজের উদ্দেশ্যহীনতার অনুভূতি একটা আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার

জন্ম দেয় যা অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের প্রধান বিষয়বস্তু। কথাগুলি The Oxford Campanian of the Theatre' গ্রন্থে বলা কথার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়– "... man's life is essentially without meaning of purpose and that human beings cannot communicate. This led to the abandonment of dramatic form and coherent dialogue, the futility of existence being conveyed illogical and meaningless speeches and ultimately by complete silence."[৬]

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুবি কোন (Ruby Cohn) পঞ্চাশের দশকের কিছু বিশেষ নাটককে অ্যাবসার্ড নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি তাঁর 'The Cambridge Guide to World Theatre' গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নাটকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন— " ... plays of absurd ... That presented man's metaphysical absurdity in aberrent dramatic style that mirrored the human situation. Never a formal movement, the playwrights of the absurd were centred in post war Paris but they soared to international fame with the unexpected success of Backett's 'Waiting for Godot'."[৭]

নাট্যকার ইউজিন আয়োনেস্কো (Eugene Ionesco) অ্যাবসার্ড শব্দটির নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন– "Absurd is that which devoid of purpose ... cut off from his religious, metaphysical and transcandental roots, man is lost all his actions become senseless, absurd, useless."[৮] আয়োনেস্কো নিজেই তাঁর নাটক প্রসঙ্গে বলেছেন 'অ-নাটক' (Antidrama) এবং তাঁর নায়ক 'অ-নায়ক' (Anti-hero)। অ্যাবসার্ড কথাটির ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন – 'Absurd is that

which has no purpose or goal or objectives.'[৯] অর্থাৎ অ্যাবসার্ড নাটক যেন মানুষের বাস্তব পরিস্থিতিকে এক অস্বাভাবিক বিকৃত রূপে প্রতিফলিত করে।

অ্যাবসার্ড নাটক নাট্যশিল্পের পূর্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রচলিত রীতিনীতি, ধারাকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এসলিন তাঁর গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন–

" If a good play must have a cleverly constructed story, these have no story or ploat to speak of, if a good play is judged by subtlety of characterization and motivation, these are often without recognizable characters and present the audience with almost mechanical puppets, if good play has to have a fully explained theme, which is neatly exposed and finally solved, these often have neither a beginning nor an end; if a good play is to hold the mirror upto nature and portray the manners and mannerisms of the age in finally observed sketches, these seen often to be reflections of dreams and nightmares; if a good play relies on witty repartee and pointed dialogue, these often consists of incoherent babbling."[১০] (এখানে good play বলতে প্রচলিত এবং these বলতে অ্যাবসার্ড নাটক বোঝানো হয়েছে)।

অ্যাবসার্ড নাটকের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় যে, প্রথা বহির্ভূত এই ধারার নাট্যকারদের উদ্ভট দর্শনের উৎসমূলে কাজ করেছিল তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। সমাজের অগ্রগতির ফলে মানবসভ্যতা ও মানবজীবনে জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়। মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সমাজ, ঈশ্বর ও তার সমস্ত মূল্যবোধগুলোর

সংস্পর্শ থেকে। মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে অচেনা পৃথিবীর অপরিচিত জীব হিসেবে। তার অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্যেহীন হয়ে পড়ে। মানুষের দেখে আসা স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কাল মার্কস-এর আমূল সমাজ বিপ্লবের ভবিষ্যৎবাণী মানুষকে আশ্বস্ত করতে ব্যর্থ হয়। হিটলারের শাসনকালে বর্বরতা, নির্বিচারে ইহুদি হত্যা এবং লুণ্ঠনের বন্যায় ইউরোপের পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বের মানুষের বিশ্বাসের মূল ছিঁড়ে যায়। স্বপ্ন আর প্রত্যাশার চিহ্নও লেশমার থাকে না। ঈশ্বরও পারে না মানুষে মানুষে, ধর্মে ধর্মে আত্মবিধ্বংসী সংগ্রামকে ঠেকাতে। ধর্ম ও ঈশ্বর মানুষের মন থেকে নির্বাচিত হয়। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে শূন্যতাবোধ দেখা দেয়। ভেঙ্গে যাওয়া সমাজে মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। ইউরোপে ফ্যাসিজমের উদ্ভব, হিটলারের ইহুদি হত্যা সারা বিশ্ব বিবেককে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ প্রাণ ও সম্পদ ধ্বংসের পাশাপাশি জীবনের অস্তিত্বে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দেয়। মানুষের জীবন এক অদ্ভুত সংকটের শিকার হয়। কেবল অভ্যাস ও যান্ত্রিকতায় ভরা জীবনের ঘেরাটোপে মুক্তির আশা নিঃশেষিত হয়। মানুষের কাছে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে পড়ে। হারিয়ে যায় শুভ ও সুন্দরের চেতনা মানবিকতা লুণ্ঠিত হয়। মানুষের জীবনে স্বদেশ ও বিদেশের সন্ধানও হারিয়ে যায়। এক চরম ভয়াবহ সংকটাপন্ন অবস্থায় কঠোর সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকে, কেবল ব্যক্তির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অদম্য স্পৃহায় মানুষ কাল অতিক্রম করে।

হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, শূন্যতা বোধ ও উদাসীনতার জগতে দ্বীপান্তরে নির্বাসিত বুদ্ধিজীবী ও অনুভূতিশীল মানুষ জীবনের কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। একারণেই পুরাণের সিসিফাসের অন্তহীন বহন করা অভিশাপের সঙ্গে মানুষের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতের মিল খুঁজে পান আলবেয়ার কামু। এই হতাশা, শূন্যতা, মানবিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের নৈরাজ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে অ্যাবসার্ড দর্শনের। এই

অ্যাবসার্ড দর্শন শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে শিল্প ও সাহিত্যের অবয়বে প্রতিফলিত হয়। নাটক, গল্প, উপন্যাস ও চিত্রশিল্প এমনকি চলচ্চিত্রেও অ্যাবসার্ড ধারণার অভিব্যক্তি বিস্তার ও ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অন্যান্য শিল্প আঙ্গিকের চেয়ে অ্যাবসার্ড ধারণার পরিপূর্ণ প্রকাশের অত্যাবশ্যকীয় প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে নাটক। সেকারণে মার্টিন এসলিন তাঁর 'The Theatre of The Absurd' অ্যাবসার্ড নাটককে বলেছেন – "Theatre of the Absurd is the true theatre of time."[১১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দেশকালের প্রেক্ষাপটে বেশকিছু নাট্যকার পরস্পর যোগ সূত্রহীন হওয়া সত্বেও নাটকের নির্মাণ, বিষয়বস্তু পরিবেশন, প্রতীক ও রূপক ব্যবহার, উদ্ভট ঘটনা ও চরিত্রে প্রয়োগ, অভাবনীয় সংলাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁদের ভাবনা অনেকটা একরকম হয়ে ওঠে। প্রথমে ফরাসি দেশে এ ধরনের নাটকের নিদর্শন দেখা দিয়েছিল। ইংল্যান্ড, পোল্যান্ড ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে এই ধারণা বিস্তার লাভ করে। ওই সময়ের ইতিহাস প্রতিবেশের বিশেষ চরিত্র তাদের নাট্যকর্মে ও শিল্পদর্শনের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে এরকম করেই ভাবতে বাধ্য করেছিল। দলবদ্ধ ভাবে সিদ্ধান্ত করে এরকম নাটক লিখতে শুরু করেননি তাঁরা। ফলে অ্যাবসার্ড নাটক কোনো প্রথাগত নাট্য আন্দোলনের বিষয় হিসেবে দেখা দেয়নি। অথচ তাঁদের নাটকের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্যসূচক লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাট্যকারেরা আবার একে অন্যের থেকে দারুণভাবে আলাদা। এ প্রসঙ্গে ড. মঞ্জু দত্তগুপ্ত মন্তব্য করেছেন– "As reflection of lean emptiness, distorted absence darkness and death are the contents of the absurd play, the techniques adopted by particular playwrights are sharply different from each other and highly individual."[১২]

পাশ্চাত্যের যে সকল নাট্যকারগণ অ্যাবসার্ড নাটকের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাদের তালিকা নিম্নরূপ:

স্যামুয়েল বেকেট : ওয়েটিং ফর গোডো ১৯৫২), অ্যাক্ট উইথ আউট ওয়ার্ড (১৯৫৬), অল দ্যাট ফল, ক্যাশ এণ্ড , ওয়াটস এণ্ড মিউজিক, হ্যাপি ডেইজ' প্লে ফিল্ম, কাম এণ্ড গো, এহ জো, এম বারস, ব্রেথ, নট আই।

ইউজিন ইয়োনস্কো: la centric chauve বা দ্য বল্ড প্রাইমা ডোনা, la lecon বা দ্য লেশন, Jaques out a soumission বা জ্যাক অর ওবিডিয়েন্স (বৃটিশ ও আমেরিকান অনুবাদে জ্যাক অর দি সাবমিশন), les chaisse বা দি চেয়ার্স, victim de deviour বা ভিকটিমস অফ ডিউটি, amedee, on comment s'em de Barr asser বা আমেদি আর হাউ টু গেট রিড অফ ইট, Le Nouveau Locataire বা নিউ টেনান্ট , Le Pieton de I'Air (A Stroll in the Air), Le Soit Le Faim(Hunger and Thirst), Le Formidable Borde (Oh What a Bloody Circus), Le Oeuf dir (The Hard -Boiled Egg), L' impromptu de I'Amla or Le Cameleon du Berger, Tuer Sans Gage বা দি কিলার, Rhinoceros বা রাইনোসেরস, Le Roi Se Murt বা এক্সিট দা কিং

জাঁ জেনে : আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ–Journal de Voleur বা The Theif's Journal (১৯৪০), নাটক– Haute Surveillance বা ডেথ ওয়াচ, Les Bonnes বা দি মেইডস, Le Balcon বা দি ব্যালকনি, Les Negres বা দি ব্ল্যাকস।

ইংল্যান্ডের নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার : দ্য বার্থ ডে পার্টি, দ্য ডাম্ব ওয়েটার, দ্য কেয়ারটেকার, দ্য পার্টি, দ্য নাইট, নো ম্যানস ল্যাণ্ড, ল্যান্ডস্কেপ অ্যাণ্ড সাইলেন্স, রোড।

ফরাসি নাট্যকার আর্থার আদামভ : দ্য প্যারডি (Le Parodia), দ্য ইনভেনশন (Le Invension), প্রফেসর তারান (Le Professor Taranne), পিং পং (Le Ping Pong)।

ফেরনান্দো আরাবল : Picnic in the Battlefield, The Two Execution, Fans and Lis, The Architect and the Emperor of Assyria.

নর্মান ফ্রেডরিক সিম্পসন : The Resounding Tinkle, The Hole, One Way Pendulum.

এডোয়ার্ড এলবি : The Zoo Story, The American Dream, Tiny Alice, Who is Alfred of Verginiawolf.

স্লাভোমির ম্রোজেক : Out at Sea, Strip-tease, The Martyrdom of Peter Ghey, The Police, Tango.

এছাড়া এসলিন আরও বহু নাট্যকারদের অ্যাবসার্ড পন্থী বলে চিহ্নিত করেছেন– ফ্রান্সের জঁ তার্দো, বোরি ভিয়াঁ, ইতালির দিনো বুজাতি দেররিকো, মানুয়েল দে পেদ্রোলো, জার্মানির ম্যাক্স ফ্রিশ, গুন্টার গ্রাস, পোল্যান্ডের তাদেউস, রোজেভিৎস প্রমুখ। অধ্যাপক পবিত্র সরকার অবশ্য এঁদের অনেককেই অ্যাবসার্ড পন্থীদের দলে আলোচনার পক্ষপাতী নন। [১৩]

যে কোন মহৎ সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনি বিদ্যমান। বিশ শতকের ষাটের দশকের এই বিশ্ব নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রথাগত ভিন্নধারার অ্যাবসার্ড নাটকের সৃষ্টির নেপথ্যে সূত্রপাতের কোন না কোন একটা চোরাস্রোত থেকে যায়। অ্যাবসার্ড নাটকের ক্ষেত্রেও পূর্ব ঐতিহ্যের সন্ধানে সমালোচকগণ সচেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছেন এবং পূর্ব

ঐতিহ্যের নানা সূত্রের সন্ধান দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। অ্যাবসার্ড নাটকে প্রকরণগত পূর্বপট সম্পর্কে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের অভিমত–

> "এসলিন নিজে অ্যাবসার্ড নাট্যবস্তুর পূর্বসূত্র নানাভাবে সন্ধান করেছেন, তাঁর বইয়ের The Tradition of The Absurd অধ্যায়ে। অর্থাৎ এই নাট্যকৃতি নির্দিষ্ট সময়ের ফসল হলেও একেবারে পূর্বাপর নয়, বরং মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা পরম্পরা ও দান্দ্বিকতার মধ্যে তার স্থান– এটা দেখানোই তাঁর লক্ষ্য। এ অধ্যায়ে তিনি অ্যাবসার্ড নাট্য প্রকরণের এবং ভাষা ভাষাদর্শনের পূর্বসূত্র সন্ধান করেছেন প্রাচীন রোমের ও ইউরোপের লোকনাট্য ও ইতালির কম্মোদিয়া দেল্লার্ত-এর ভাঁড় চরিত্রে বা ভাঁড়ামির ঐতিহ্যে, শেক্সপিয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম'এ খেটে খাওয়া লোকগুলির নাট্যভাষায়, মার্কিনি ভোদভিল-এ, 'পাঞ্চ ও জুড়ি' রঙ্গনাট্যে, কিস্টোন কপস্, চ্যাপলিন, বাস্টার কিটন এবং মার্কস ব্রাদার্সের চলচ্চিত্রে। অভিকর শিল্প (পারফর্মিং আর্টস) ছাড়াও ইউরোপের সাহিত্যে এসলিন পেয়েছেন ভাষাগত অ্যাবসার্ড বা ননসেন্সের বহু পূর্বসূত্র– শেকসপিয়র থেকে লিয়ার ও লুইস ক্যারল, জার্মান লেখক মর্গেনস্টার্ন এবং নার্সারি ছড়া পর্যন্ত। তাছাড়া সাহিত্য নাটকের ক্ষেত্রে দোস্তয়েভস্কি, কাফকা, জেমস জয়েস, 'উবুরোয়া'র লেখক আলফ্রেড ইয়ারি, সুররিয়ালিজম, দাদাবাদ– এসব তো আছেই। দার্শনিক ভিনগেনস্টাইনের 'শব্দক্রীড়া'র সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষা প্রকরণের সাদৃশ্য পেয়েছেন এসলিন। তবে পরবর্তী অধ্যায় এসেছে The Significance of the Absurd এ এসেছে অ্যাবসার্ড নাটকের দর্শনভূমির কথা। নিটসের 'জরাথুষ্ট্র উবাচ' (Thus Spake Zarathustra)র 'God is dead' থেকে আরম্ভ করে আলবেঅর কাম্যু

পর্যন্ত এই উত্তরাধিকারের পর্যবেক্ষণ। ... সে নাট্যগুচ্ছ নিজে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক বস্তু হয়ে উঠেছে।"[১৪]

অবশ্য একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্ভব ও ব্যাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। তবুও এ ধরনের নাট্যরীতির আদি পুরুষ হিসেবে প্রখ্যাত সুইডিশ নাট্যকার জোহান অগাস্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯–১৯১২) এবং বিশিষ্ট ইতালিয় নাট্যকার পিরানদেল্লো (১৮৬৭–১৯৩৬)-র নাম উল্লেখ করেছেন সমালোচকগণ। স্ট্রিম রবার্ট ন্যাচারালিস্ট এবং এক্সপ্রেশনিস্ট আন্দোলনের যুগসন্ধি পর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যদিকে পিরানদেল্লো গ্রোটেস্ক উদ্ভট এবং অ্যাবসার্ড নাটকের ক্রান্তিকালের পটভূমিতে নাটক রচনা করেছেন। এঁদের নাটকে বিচ্ছিন্নতাবোধ, চৈতন্যগত অবক্ষয় ও হতাশা– সব মিলিয়ে অস্তিত্বজনিত আতঙ্কের পরীক্ষার কথা পাওয়া যায়, যা আজকের অ্যাবসার্ড নাটকের ধর্ম। এছাড়া আধুনিক নাটকের বিষয় ভাবনা এবং আঙ্গিক গত সমস্যাও এঁদের নাটকে স্পষ্ট। এই সমস্ত বিষয়গুলি অ্যাবসার্ড নাট্যকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কেউ কেউ আবার ফরাসি নাট্যকার আলফ্রেড জারীর 'উবুরয়' (১৮৯৬) ট্রিলজিকে অ্যাবসার্ড নাটকের জনক বলে মনে করেন। ঈশ্বরের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার কাছাকাছি সময়ে লেখা ও অনুষ্ঠিত আলফ্রেড জারীর 'উবুরয়'কে পরবর্তী শতাব্দীর সুদূর পঞ্চাশের দশকের অদ্ভুত নাটকের পূর্বসূরী হিসেবে দেখা হয়েছে। টেরি হজসন 'থিয়েটার অফ দি অ্যাবসার্ড' প্রসঙ্গে বলেছেন—

" it derive clearly from the dada and Surealist art movements. Its originator was reputedly Alfred Jarry (1873–1907) author of Ubu Roi (1896)."[১৫]

'উবুরয়' সম্পর্কে এসলিন বলেছেন –

> "Ubu is a savege caricature of a stupid, selfish bourgeois seen through the cruel eyes of a school boy, but the Rabelaisian characters with Falstaffian greed and cowardice, is more than mere social satire. He is a terrifying image of animal nature of man, his cruelty and ruthlessness. ... He is mean, vulgar and incredibly brutal a monster that appeared ludicrously exaggerated in 1896, ..."[১৬]

আধুনিক অ্যাবসার্ড দর্শনের সঙ্গে জারীর তুলনায় স্ট্রিণ্ডবার্গ ও পিরানদেল্লোর প্রভাব অনেক বেশি। 'উবুরয়ে'র আঙ্গিক ও বিষয় চেতনায় অ্যাবসার্ড ধারণার মিল বিশেষ উল্লেখ্য। কিন্তু স্ট্রিণ্ডবার্গের 'এ ড্রিম প্লে', ' দ্যা গোস্ট সোনাটা', 'দ্য গ্রেট হাইওয়ে', ' দ্য রোড টু দামাস্কাস' নাটক গুলিতে অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের আভাস স্পষ্ট। স্ট্রিন্ডবার্গের নাটকগুলি সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক ডি. জে. পামার মন্তব্য করেছিলেন –

> "The subjective and experimental qualities of Strindberg's work make it difficult and sometime obscure... ."[১৭]

অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে যে কাঠিন্য ও দুষ্পাঠ্যতার লক্ষণ রয়েছে পামার তারই ছাপ দেখেছেন স্ট্রিণ্ডবার্গের রচনাগুলিতে। অন্যদিকে পিরানদেল্লো সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্বে ন্যাচারালিস্ট ছিলেন। তাঁর সময় ইতালির সাহিত্য জগতে ন্যাচারালিজম প্রধান বিষয়। জীবনের ফরমালিজম তাঁর কাছে এক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি জীবনের সীমাবদ্ধতাকে দেখবার চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে মহাজগৎ ধারণার মধ্যে

শূন্যতাবোধ যাকে তিনি 'hollow concept' বলেছেন। তিনি প্রথাগত আর্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছেন। তাঁর 'সিকস ক্যারেক্টার ইন সার্চ অফ অ্যান অথর ডায়না অ্যান্ড টুডা', 'হোয়েন ওয়াজ ইন ইজ সামবডি' ইত্যাদি নাটকগুলিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রত্যয়ী নেতা, যুগযন্ত্রণা, অস্থিরতাবোধ প্রধান উপজীব্য। তিনি জীবন থেকে বেরিয়ে এক মহত্তর জীবনের সন্ধান করেছেন। তাঁর নাটকের স্বপ্নাচরণ ঘটেছে একারণেই। তাঁর এই দর্শন পুরোপুরি অ্যাবসার্ড না হলেও উদ্ভট তো অবশ্যই। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীকালের অ্যাবসার্ডপন্থী নাট্যকারদের সৃজন কলাকে পুষ্ট করতে সাহায্য করে।

তবে সুররিয়ালিজম, ডাডাইজম, আভাঁগার্দে রচনা এবং এক্সপ্রেশনিস্টদের রচনাবলীর প্রভাব অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের উপর অনেকখানি। ফরাসি আভাঁগার্দ পন্থীদের কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল। তারা বাস্তব সম্মত রচনা পরিহার করে চলতেন। আলফ্রেড জারীর ও অ্যাপোলিনেয়ার (১৮৮০-১৯১৮) সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের ডাডাইজমের অগ্রদূত। অ্যান্টোনিও আরতাউদ (১৮৮৬-১৯৪৮) ও ভিট্রাক (১৮৯৯-১৯৫২) এঁরা সুররিয়ালিজম-এর প্রতিষ্ঠাতা। সুররিয়ালিস্ট অ্যাপলিনেয়ার দাবি করতেন–

> "Arts should be more real than reality and deal with essences rather than apprearances."[১৮]

ডাডাইস্টরাও এরকমই ভাবতেন। এঁদের মতো অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মধ্যে 'ননসেন্স এলিমেন্ট' প্রাধান্য পায়।

> "বিজ্ঞানের কিছু ধারনা অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মনোভাব গঠনে কিছু সাহায্য করে থাকতে পারে। 'Einstein at one blow appeared to invalidate both Euclid the rational conception of time and space.' মাইক্রোফিজিক্স বলতে চাইল 'logically

impossible could and did happen.' অ্যাটমিক ফিজিক্স ইঙ্গিত দিল যে, 'effect need heve no cause, and the phenomena might create themselves out of nothing,' Absurd চিন্তায় এসবের প্রতিফলন স্পষ্ট।"[১৯]

অ্যাবসার্ড নাটকের অস্তিত্বের অর্থহীনতা ও একাকীত্বের অন্ধকার ভরা দর্শনের উদ্ভবের মূলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া এবং এক্সিস্টেনশিয়ালিজম (Existentialism) -এর প্রভাবের কথা বলেছেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত–

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ধ্বংস ও হত্যার এক পাশবিক উল্লাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই রক্তস্রোত এই ধারণায় মানুষকে পৌঁছে দেয় যে রক্তপাত ও ধ্বংসের খেলার বুঝি শেষ নেই। নিজের হাতে গড়া সভ্যতা মানুষ নিজের হাতেই চূর্ণ করছে, মানবিক মূল্যবোধ শূন্যে বিলীন, মূল্যবোধের নশ্বরতা মহাসত্য হয়ে উঠল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। অন্যদের থেকে অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা এই দুর্ঘটনায় অনেক বেশি বিচলিত হয়েছিলেন। মানুষের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অস্তিত্বের অর্থহীনতা, অসঙ্গতি, শূন্যতাকেই তাঁদের সত্য বলে মনে হল। হিরোশিমা, নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনা, নিউক্লিয়ার বোমায় উদ্যত ত্রাস তাঁদের এই মানসিকতাকেও আরও দৃঢ় করে তুলল। অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের দর্শনে যে মহাযুদ্ধেরই একটা প্রতিক্রিয়া তা সহজেই অনুমেয়।"[২০]

তিনি অ্যাবসার্ড নাটকের নিজস্ব দর্শনের ভিত আরও শক্ত হওয়ার পিছনে মহাযুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অস্তিবাদী দর্শনের চিন্তার সংযোগের কোথাও বলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত–

"উনিশ শতকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে জার্মান এবং ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধ ও পাশ্চাত্য দেশের কতগুলি স্থায়ী ধারণা ও মূল্যবোধ এসময় ভেঙে পড়তে থাকে। এই অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদের চিন্তায় ইন্ধন যোগায়। 'Existentialism is the philosophic stand point which gives priority to existence over essence.' এই দর্শনে মানুষ সম্পর্কে যত অভিধাই (essence) দেওয়া হোক না কেন একজন conscious being নিজেকে যা মনে করে (existence) সে তা-ই। (I am) > [existence] a (man) > [essence] এই মতবাদের কতকগুলি theme আছে। যেমন ১. anxiety বা sense of anguish, ২. absurdity, ৩. nothingness বা the void ৪. alienation বা estrangement (বিচ্ছিন্নতাবোধ)। অস্তিত্ববাদের এই সমস্ত theme-ই আমরা absurd philosophy-র মধ্যে ব্যক্ত হতে দেখি।

ডেনমার্কের সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) অস্তিবাদীদের forerunner-দের অন্যতম। তাঁর একটি উক্তির মধ্যে আমরা যেন absurdist-দেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই– I stick my finger into existence – It smells nothing. Where am I ? What is this thing called the world ? Who is it who has lured me into thing, and now leaves me here ? Who am I ? How did I come into the world ? Why was not consulted ?" [২১]

আবার ইটালিয়ান নাট্যকারগণ 'The Theatre of The Absurd'-এর পূর্বসূরী (precursor) হিসেবে 'The Theatre of The Grotesque' -এর কথা বলেছেন। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অ্যাবসার্ড-এর মতো 'Grotesque'ও এক ভিন্নতম শৈল্পিক রীতি। 'Grotesque' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'grotto', 'caves' থেকে এসেছে, যার বিশেষণ 'grottosco' এবং বিশেষ্য ' la grottesca' । যার অর্থ 'strange', 'fantastic', 'ugly', 'bizarre' । ১৫৩২ সালে ফ্রান্সে প্রথম 'Crotesque' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরে ১৬৪০ সালের দিকে ইংরেজিতে শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয় 'grotesque' হিসেবে। এ প্রসঙ্গে জানা যায় –

> "which originated from Greek kryple 'hidden place', meaning a small cave or hollow. The original meaning restricted to an extravagant style of Ancient Roman decorative art rediscovered and then copied in Rome at the end of the 15th century." [২২]

Grotesque-এর প্রথম ব্যবহার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

> "decorative ornaments consisting of medallions, sphinxes, foliage, rocks and pabbles. Because they were found in grottoes they were called grotteschi. The term came to be applied to painting which depicted the intermeaning of human animal and vegetable themes and forms."[২৩]

ষোড়শ শতকে 'Grotesque' শব্দটি সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় 'apropose part of body' বোঝাতে। কিন্তু 'Neoclassicism'-এর যুগে 'The ridiculous, bizarre, extravagant, Freakish and Unnatural, in short aberration from the desirable norms of harmony, balance and proposition' বোঝাতে সাধারণ ভাবে বহুল প্রচলিত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাহিত্যে 'grotesque' শব্দটি Montaigne প্রথম ব্যবহার করেন তাঁর প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকে The strange, fantastic, ugly, incongruous, unpleasant, disgusting-এর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় grotesque শব্দটি। এছাড়া grotesque সম্পর্ক বলা হয়েছে –

> "In a comparable way the writer employs grotesque for comic and satirical purposes. In literature one is most likely to find grotesque elements in caricature, parody, satire, invective, Burlesque, black comedy, the macabre and what is known as the Theatre of the Absurd (qq.v.). Grotesque is often an constituent of comic relief (q.v.), the sick joke, sick verse (q.v.), and pornography (q.v.). Excellent example of the grotesque can be found in the work by Rabelais, Skelton, Webster, Tourneur, Swift, Pope, Smollett, Byron, E.T.A. Hoffmann, Victor Hugo, E.A. Poe, Zola, Dickens, Browning, Kafka, Alfred Jarry, Samuel Beckett, Avelyn Waugh, Mervyn Peake, Genet, Ionesco and Roald Dahl."[২৪]

Grotesque-এর ধারণা ‘decorating’-এর সূত্রে উদ্ভুত হলেও সমালোচকগণ একে একেবারে পূর্বাপর ঐতিহ্যহীন মনে করেননি। তাঁরা grotesque-এর পূর্বগ ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। Grotesque- এর পূর্বসূত্র প্রসঙ্গে তাঁদের মত –

> “The earliest written texts describe grotesque happening and monstrous creatures. The literature of Myth has been arich source of monsters; from the one eyed Cyclops (to cite one example) from Heriod’s Theogony to Humour's Polyphemus in the Odyssey. Ovid’s Metamorphoses is another rich source for Grotesque transformations and hybrid creatures of Myth. Horace's art of poetry also provide a formal introduction classical values and the dangers of grotesque or mixed form. Indid the departure from classical models of order, reason, harmony, balance and form opens up the risk of entry into grotesque world's. Accordingly British Literature abounds with native grotesquerie, from the strange world's of Spencer's allegory in the Faerie A, to tragi-comic modes of the 16th century drama (Grotesque comic elements can be found in major works such as King Lear).”[২৫]

ভাবগত দিক থেকে grotesque এবং absurd প্রায় একই অর্থ বহন করে। যদিও grotesque সাহিত্যের তুলনায় absurd দর্শন আধুনিক। তবুও একটা সময়

অদ্ভুত বা উদ্ভট কিছু বোঝাতে grotesque এবং absurd প্রায় সমার্থক ভাবে ব্যবহার করার প্রয়াস হয়েছে। তবে grotesque এবং absurd 'ridiculous', 'highly eccentric' 'stupid' অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই দুটি শব্দ সম অর্থ ও ভাবাদর্শ বহন করে না। Absurd 'opposed to reason' হলেও তা grotesque বাহক হয়ে ওঠে না। তাই grotesque-র সঙ্গে absurd-এর পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উভয় ধারণার পার্থক্য সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> "But the choice between 'absurd' and 'grotesque' for such Scenes represents a false alternative, for there is no reason why all of these should not be absurd (in the sense in which the word is currently applied) and grotesque at the same time. There is no however a social difference between the two terms. We have seen that the grotesque can be reduced to a certain formal pattern. But there is no formal pattern, no structural characteristics peculiar to the absurd; it can only be perceived content, as a quality of feeling or atmosphere, an attitude or world view. The formal means of presenting it many and varied; the absurd can be expressed through irony, or philosophic argument, or through the grotesque itself. In connection with latter possibility, we should note that consistant perception of the grotesque, or the

perception of grotesqueness on a grand scale, can lead to the nation of universal absurdity."[২৬]

সুতরাং একথা বলা যায় যে grotesque এবং absurd এর সমার্থক হিসেবে Extravaganza, Satire, Burlesque, Farce প্রভৃতি নাট্য রীতির কথা বলা হলেও বিষয়ভাবনা, জীবনদর্শন, আখ্যান ও প্রকরণগত বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অ্যাবসার্ডের সঙ্গে গ্রোটেস্ক-এর পার্থক্য ভাবগত। দর্শনের দিক থেকেও উভয় রীতির মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। অ্যাবসার্ড দর্শন যে সার্বিক শূন্যতার কথা বলে গ্রোটেস্কির মধ্যে তা অনুপস্থিত।

অ্যাবসার্ডপন্থী নাট্যকারদের নাটকে অনুসৃত নাট্যরীতি ও নাট্যবিষয় অদ্ভুত এবং উদ্ভট। এই অদ্ভুত ও উদ্ভট ভাবনা আসলে একটা কাল্পনিক সত্যের সন্ধান। জাগতিক বিশ্বে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে মানুষ সম্পূর্ণ একা-নিঃসঙ্গ, সার্বিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন। এই সকল অ্যাবসার্ডপন্থী নাট্যকারদের নাটকে ব্যবহৃত নাট্যদর্শনের প্রেক্ষিতে উদ্ভট বা অ্যাবসার্ড নাটকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরভিং ওয়ার্ডেল লিখেছেন –

"Its characteristics are the substitution of an inner landscape for the outer world; the lack of any clear division between fantasy and fact, a free attitude towards time, which can expand or contract according to subjective requirements; a fluid environment which projects mental conditions in the form of visual metaphors; and an iron precession of language

construction as the writers only defence against the chaos of living experience."[২৭]

অ্যাবসার্ড নাটকের প্রভাব এবং বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে 'The Cambridge Guide to World Theatre' থেকে জানা যায়–

> "Almost every non-realistic modern dramatist has had this level affixed thereafter. Certain absurdist techniques have nevertheless, established themselves in the contemporary theatre and it is in this formal sense, rather than a philosophical one, that the idea of theatre of the absurd has been maintained in critical currency. Among the techniques are the rejection of narrative continuity and character coherence and of the rigidity of logic, leading to ridiculous conclusions scepticism about the meaning of language, bizzare relationship of stage properties to dramatic situations. Such techniques have occasionally resulted in memorable stage images." [২৮]

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে অ্যাবসার্ড নাটকের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট কথা বলা যায়। অ্যাবসার্ড নাটকের প্রথাসিদ্ধ নাট্যরীতির প্রচলিত কাঠামো অনুসরণ না করে তা বাতিল করা হয়েছে। নাটকের প্লট অ্যারিস্টটলের মতে যা নাটকের প্রাণ (the soul of the play) তার গুরুত্ব এখানে হ্রাস পেয়েছে। প্লট এখানে বর্জিত হয়েছে। প্লটের পরিবর্তে থিম বা আখ্যানবস্তুকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া

হয়েছে। এই থিমকেই অ্যাবসার্ড নাট্যকারগণ নাটকীয় উৎকর্ষতা দান 'theatrically heighten' করে একটা 'ড্রামাটিক ইমপ্যাক্ট' বা নাট্য সংঘাত সৃষ্টি করেন। নাট্যকাহিনির আদি, মধ্য, অন্ত্য এই স্তর বিভাগও এখানে নেই। অ্যাবসার্ড নাটক কাহিনি ভিত্তিক নয়, situation বা পরিস্থিতি অনুযায়ী। 'Exposition, rising action, climax, denouement, catastrophe' এই কাঠামো অনুসরণ করে যে অ্যারিস্টটলীয় নাট্য পদ্ধতি অব্যাহত আছে এখানে তা অনুসরণ করা হয়নি। অ্যাবসার্ডপন্থী নাট্যকারগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় ঘটনাক্রমের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত চক্রাকার কাঠামো অনুসরণ করার প্রতি অধিক আগ্রহী। এধরনের নাটকে 'exposition' অর্থাৎ নাটকীয় উদ্ভাস নেই বললেই চলে। Rising action বা development of complication এই ধরনের নাটকে তা illogical, nonsensical প্রকৃতির হয়, আবার তা কখনো কখনো Comical হয়ে থাকে। তাই গতানুগতিক নাটকের মতো এ নাটকে rising action প্রতিফলিত হয় না। অ্যাবসার্ড নাটকের বিষয় ট্র্যাজিক হয়, কিন্তু নাটকের পরিসমাপ্তি অ্যারিস্টটল নির্দেশিত catharsis এর মাধ্যমে কোনো আনন্দের (pleasure) সংবিদ দেয় না, বরং এক শ্বাসরুদ্ধকর অসহায় দোলাচল আতঙ্কের পরিবেশে বদ্ধ করে রাখে। অ্যাবসার্ড নাটকের ঘটনাক্রমের সমাপ্তি নেই বললেই চলে, কারণ যে শূন্যতার মধ্যে এই নাটকের চরিত্রগুলি আবদ্ধ তারা এই অবস্থার কোনো রকম সমাপ্তিতে পৌঁছাতে পারে না। অর্থহীনতাকে বয়ে চলার মধ্যেই এই নাটকের ট্র্যাজেডি। তাই 'ওয়েটিং ফর গোডো' (Waiting for Godot) নাটকের মতোই এধরনের নাটকের উপসংহারে দেখা যায় গোডোর জন্য অপেক্ষা দিয়ে নাটকের শুরু এবং ওই অপেক্ষাতেই শেষ। পাঠকের প্রত্যাশা বা যুক্তিকে এ নাটক এড়িয়ে যায়। কেবল কতগুলো প্রশ্ন মনে জাগায়, মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রকট থেকে আরও প্রকটতর দৃশ্যে দৃশ্যমান করে তোলে যার ফলে দর্শক বা পাঠক তার স্বস্তির জায়গা থেকে অস্বস্তি এবং বিপন্নতাবোধের ঘুর্ণিপাকে তাড়িত হয়।

অ্যারিস্টটল নির্দেশিত নাটকের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা conflict একটি অন্যতম শর্ত। কিন্তু অ্যাবসার্ড নাটকে মুখ্য চরিত্রে দ্বন্দ্ব দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। চরিত্রগুলো প্রায়ই তাদের আইডেন্টিটি বদলাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেক সময় স্থির কেন্দ্রীয় চরিত্রই থাকে না। আবার এই নাটকে দর্শন অনুযায়ী কারো সঙ্গে কারোর গভীর সম্পর্ক দেখানোর কোনো সুযোগ নেই। চরিত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা না থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই দ্বন্দ্ব সেখান অনুপস্থিত। তাছাড়া এ নাটকের চরিত্রে অতীত অভিজ্ঞতাজাত conflict বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ নেই। কারণ এক্ষেত্রে চরিত্রগুলি তাদের অতীতের স্মৃতি বিস্মৃত। এখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার জন্য চরিত্রগুলি তাদের অবস্থা বা অবস্থানের বদল ঘটায়।

অ্যাবসার্ড নাটকের শিল্প রীতিতে ভাষা বা সংলাপ এক স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে। ভাষা এখানে সংযোগের (কমিউনিকেশনের) মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। তাই অ্যাবসার্ড নাটকের ভাষাকে কমিউনিকেশন-এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য ভাবা হয় না। তাঁদের বিচারের ভাষা সত্যকে যতটা প্রকাশ করতে পারে ততটা লুকাতেও পারে। ভাষা মানুষকে আত্মগোপন করতে সুযোগ করে দেয়। ভাষার চরিত্রই ভাষার উপর বিশ্বাস রাখতে দেয় না। একারণে তাঁদের নাটকের সংলাপে আবোল- তাবোল, বেখাপ্পা, অসংলগ্ন, অর্থহীনভাবে ব্যবহার করে বিদ্রূপ করেছেন। কখনও বা 'mime', 'silence' বা 'pause' ব্যবহার করে বক্তব্যের আসল অর্থ বোঝার কৌশল নেওয়া হয়েছে– বক্তার উহ্য অর্থ (implied meaning) প্রকাশের চেষ্টায়। আবার কখনো ভাষা (ল্যাঙ্গুয়েজ) এর বদলে 'act' এনেছেন। যেখানে 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকে 'গোডো আজ আসবে না' এই খবর এলো তখন ভ্লাদিমির চলে যাওয়ার কথা বলে– 'চলো, আমরা চলে যাই।' এস্ট্রাগণ তাতে সহমত হয়ে বলে – 'চলো'। কিন্তু তারা বসেই থাকে, নড়ে না। এখানে 'চলো' কথাটিকে নিরর্থক হিসাবে ব্যবহার করেছেন বেকেট। কারণ চলা মানে তো এক জায়গা থেকে অন্যত্র যাওয়া। শারিরীক ভাবে এক জায়গা

থেকে অন্য জায়গায় হয়তো যেতে পারে, কিন্তু মেটাফিজিক্যালি তারা অবস্থান থাকতে পারে না। অ্যাক্ট-ই তাদের বিপন্নতাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। এই ভাবে ভাষার ব্যবহার না করে অ্যাক্ট বা নানারকম নাটকীয় মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে বক্তব্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন অ্যাবসার্ড নাট্যকার সমাজ।

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে probable impossiblity এবং improbable impossiblity এই কথার মধ্য দিয়ে 'বিশ্বাস্য অসম্ভবের' উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা অবিশ্বাস্য সম্ভব এই অবস্থা থেকে প্রায় অবিশ্বাস্য অসম্ভব (improbable impossiblity) এ আস্থা জ্ঞাপন করলেন। ফলে এ ধরনের নাটকে উদ্ভটত্বই প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।

এ ধরনের নাটকের গঠন realistic বা logical নয়। এই শ্রেণির নাটকের গঠন কাব্যধর্মী ভাবাশ্রয়ী। কোন একটি ভাব কে আশ্রয় করে প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে বিকশিত হয় নানা ইমেজ এর মাধ্যমে। সারফেস রিয়ালিটি থেকে সরে এসে এ নাটক 'সাইকোলজিকাল রিয়ালিটি, ইনার রিয়ালিটি বা সাবকনসাস ট্রুথকে প্রকাশ করে। মানুষের বাহ্য পরিচিতিকে উপেক্ষা করে অবচেতন রহস্যের উন্মোচন এখানে প্রবল।' এখানে বিষয়, ঘটনা ও চরিত্রের ইনার রিয়ালিটি দেখানোর জন্য নাটকের approach non-realistic। তাই প্রত্যেক absurd নাট্যকারই anti-realist। তাদের নাটক anti-play, radical play। এ নাটক বাস্তব যুক্তিকে মানে না, nonsense এর মাধ্যমে আবিষ্কার করে sense, গভীরতম অস্তিত্বের সংকটের কথা বলে। এ নাটক যতটা বলে তার চেয়ে দেখায় বেশি।

অ্যারিস্টটল time, space, action এবং unity র কথা বলেছেন। শেক্সপীয়ার এবং অন্যান্য প্রতিভাবান নাট্যকারগণ এই 'time', 'space' এবং 'action' এই তিনটি 'unity'র কথা মান্য করেছেন । অ্যাবসার্ডিস্টরা এই 'unity' কে গ্রহণ না করে

তাদের ‘subjective world’ কে তুলে ধরতে সচেষ্ট প্রয়াস করেন। তাই এই নাট্যজগতে ঘড়িতে ২৯ টা বাজে। এক রাতে চারা গাছ ডালপালা মেলে ফুল ফোটায়, মৃত দেহের অভ্যন্তরে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো জন্ম নেয়। তার কল্পনার উদ্ভাস, প্রথা ভেঙে নতুন রীতির জন্ম। ‘realism’ থেকে সরে এসে এই ‘form’ তাই কল্পনার জগতে সহজেই চলে যায়। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্যই অ্যাবসার্ড নাটক experimental নাটকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে অ্যাবসার্ড নাটকের চিন্তা ও চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল ফ্রান্স। অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র পাশ্চাত্যে। এই অ্যাবসার্ড নাটকের ঢেউ বাংলার নাট্যকারদের উপরেও এসে লেগেছিল। ষাট-সত্তরের দশকে বাংলায় নাটক লেখা ও অভিনয় হয়। ১৯৬৪ সালে ‘বঙ্গীয় নাট্য সংসদ কর্তৃক’ আয়োনেস্কোর 'rhinoceros' নাটক এর বাংলা অনুবাদ (সোমেন চন্দ নন্দীর অনুবাদ) করে মঞ্চস্থ করা হল প্রথম নিউ এম্পায়ারে। বাংলায় এই অদ্ভুত ধরনের বা উদ্ভট (অ্যাবসার্ড) নাটক লেখার প্রয়াস করেন বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার (বেদানার কুকুর ও অমল), নভেন্দু সেন (নয়ন কবিরের পালা), ইন্দ্র উপাধ্যায় (টোরাড্যাকটিল), দীপক মিত্র (অমৃতের পুত্র), বর্ণিক রায় (কয়েদখানা, স্ফুলিঙ্গ, নীলবিষ), প্রণব মিত্র (কণ্ঠস্বর), অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় (আগন্তুক পদশব্দ),গিরি শংকর (লেপিডোটেরা), গোপাল দে (অপমৃত্যু গুলোর নাম সংকল্প) প্রমুখরা। বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড প্রবণতা সম্পূর্ণ অর্থে পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের অনুসারী নয়। প্লট- চরিত্র- সংলাপ এসব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটকে যে উদ্ভটত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট তা বাংলা নাটকে মেলে না। তবুও বাংলায় উদ্ভট অ্যাবসার্ড নাটক রয়েছে। নাটক গুলির সংলাপ অদ্ভুত ফাঁপা অর্থহীন। চরিত্র ও প্লটেও উদ্ভটের লক্ষণ আছে। অ্যাবসার্ড নাটকের এই ‘রিয়ালিটি’ ‘ইনাররিয়ালিটি’ তা অবচেতন রহস্যের উন্মোচন ঘটায়। সেই অবচেতন রহস্যকে উন্মোচনের প্রচেষ্টা রয়েছে বাংলা নাটকে। তবে পাশ্চাত্য অ্যাবসার্ড নাটকের

সার্বিক শূন্যতাবোধ বাংলা নাটকে প্রকট নয়। বাংলা অ্যাবসার্ড নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত –

> "জীবন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং লক্ষ্যহীন, সুতরাং প্রচলিত জীবনধারণের বাঁধাধরা প্রথা সম্পূর্ণ অর্থহীন । ইঁহারা* মনে করেন, প্রত্যক্ষ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব বলিয়া কিছু নাই, সহসা আমাদের এমন মনে হয়, আমাদের পায়ের নিচে যে মাটি আছে, তাহাও সত্য নহে, আমরা যেন শূন্যে দাঁড়াইয়া আছি, কখন কোন মুহূর্তে গিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোথায় পড়িবো, তাহার স্থিরতা নাই। জীবনের কোন নির্ভরতা নাই, আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই- এক অন্তহীন মহাশূন্যে জীবন আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষে মানুষে স্নেহ, মমতা প্রেম ইত্যাদির কোন সম্পর্কও মিথ্যা, পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকাই যন্ত্রণাদায়ক, অস্তিত্ব এক দুঃসহ জ্বালা।"[২৯] (*ইহারা বলতে বেকেট ও আয়নেস্কোকে বুঝিয়েছেন)

সোমেন চন্দ্র নন্দী তাঁর 'অ্যাবসার্ড নাটক কি ও কেন' প্রবন্ধে অ্যাবসার্ড নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন – ' অ্যাবসার্ড নাটক বলতে আমরা সেই নাটককে বুঝবো যা বক্তব্যে বা প্রকাশ ভঙ্গিমায় বা রচনাশৈলী তে স্বাভাবিক নাটক এর নিয়ম কানুন অস্বীকার করে। বিদেশি সমালোচকদের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি surface reality কে ভেঙে দেওয়াই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রধান পরিচয়।'[৩০]

পাশ্চাত্যের ন্যায় বাংলা উদ্ভট নাটকের ও পূর্ব প্রস্তুতির তথা পূর্ব ঐতিহ্যের সূত্র আবিষ্কার করেছেন সমালোচকগণ। এ প্রসঙ্গে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> "আমাদের রূপকথা, পুরাণ, মহাকাব্যের গল্পে উদ্ভটের বিপুল সমাবেশ অথচ তার মধ্যে থেকে গভীরতর অর্থ আবিষ্কার সম্ভব। আমাদের দেবদেবীর মূর্তি কল্পনাকে ও বাস্তবকে অস্বীকার করে এক অসম্ভবকে তাৎপর্যময় মহিমায় বারবার ব্যাখ্যার অবকাশ রচনা করা হয়েছে । দশভুজা দুর্গা, ত্রিনয়ন ঈশ্বর ও ঈশ্বরী, চতুর্মুখ ব্রহ্মা- এঁদের প্রত্যেকটি রূপকল্পনা আমাদের উপলব্ধির মধ্যে তন্ময় ও বিশ্বাস্য । অর্থাৎ আমার মনে হয় আমাদের দেশের উদ্ভটকে বিশ্বাস করে তোলার চিত্তভূমি বহুকাল ধরে প্রস্তুত।"[৩১]

শুধু তাই নয় বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের আধুনিক সাহিত্যেও এই অদ্ভুতধর্মীতা অনুমিত হয়েছে সচেতনভাবে অ্যাবসার্ড এর ধারণা গড়ে ওঠার বা এর সাহিত্যিক বা নাট্যিক প্রয়োগ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই। রবীন্দ্রনাথই তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকে বাস্তবতার পূর্ব প্রথা ভঙ্গ করেছেন। অনেকে তাঁর এই ভাবনার মধ্যে অ্যাবসার্ড এর দর্শন উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে অ্যাবসার্ড এর ছায়া প্রতিফলিত। তবে বাংলা নাটকে অ্যাবসার্ড নাট্যকার হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে বাদল সরকার ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে। অধ্যাপক পবিত্র সরকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অ্যাবসার্ড দর্শনের আংশিক সূত্রগ্রহণের কথা বলেছেন। আবার ড. দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব বিচার' শীর্ষক গ্রন্থে 'অ্যাবসার্ড বা কিমেতি' নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "মোহিত চট্টোপাধ্যায় Absurd নাটক লিখে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান। তিনি এই বিশেষ শ্রেণীর নাটকের নাম দিয়েছেন কিমিতি"।[৩২]

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ শতকের ষাটের দশকের নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক যে প্রচলিত প্রথা বহির্ভূত এক অভিনব প্রকৃতির তা তাঁর নিজের বক্তব্যেই ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন –

> "বাস্তবধর্মী যে নাটক, তার চরিত্র সৃষ্টি করা খুব কঠিন। দুটো ভিতর-বাইরের মানুষকে রাখতে পারছি না, আর এই চরিত্রগুলো আদতে যেমন, তেমন করে আনতে পারছি না। এমনকি আমাদের জীবনে আইডেন্টিটি অফ ফিক্সক টাইম অ্যান্ড স্পেসও নেই। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সব সময় একটা টেন্স এর উপর দাঁড়িয়ে আছি - বর্তমান -অতীত বা ভবিষ্যৎ। আমাদের চরিত্রই হচ্ছে, এই বর্তমানে আছি তো এই একটু অতীত ভেবে নিলাম, তারপর চলে গেলাম ভবিষ্যতের কোন ভাবনায়। এই তিনটি কালে আবর্তিত হচ্ছে আমাদের জীবন। কিন্তু একটা রিয়ালিস্টিক নাটক করতে গেলে দেখা যাবে প্রধানত প্রেজেন্ট টেন্স এর ওপরেই নাটকটা লেখা হচ্ছে। এটা কিন্তু স্বাভাবিক নয়, এটাও রিয়ালিস্টিক নয়। কিন্তু অন্য অনেক নাটক লেখা হচ্ছে যেখানে এই ফিক্সড টাইম এন্ড স্পেস তাঁরা ভেঙে দিচ্ছেন এটা রিয়ালিস্টিক, অন্যটা নয় । আমি তখন ঠিক করলাম রিয়ালিস্টিক নয়, নন রিয়ালিস্টিক- বাস্তবতাবর্জিত নাটক আমি লিখবার প্রয়াস করবো।"[৩৩]

তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে প্রায় শতাধিক পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক ও অণুনাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটককার জীবনে পর্বান্তর ঘটেছে বারবার। তাঁর প্রথম দিককার নাটকের প্রকাশভঙ্গি নিশ্চিতভাবে স্বতন্ত্র। 'এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে অ্যাবসার্ড গোষ্ঠীর নাটককার হিসেবে চিহ্নিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য সত্বেও জাঁ

জেনেকে অ্যাবসার্ড গোত্রের নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করেননি জাঁ পল সার্ত্র।'[৩৪] নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর নাটককে অ্যাবসার্ড নাটক বলবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য –

> "অনেকে অ্যাবসার্ড নাটক বলেছেন। কিন্তু অ্যাবসার্ড দর্শন আমার নাটকে নেই - শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দেখে অ্যাবসার্ড বলা যায় না , যে শূন্যতার দর্শন অ্যাবসার্ডে থাকে তা এতে নেই। তাহলে এটা কী- আমি নিজে মনে মনে ভাবতাম। ... আবার এও বলেছি আমার নাটক হবে কিমিতি। কিমিতি মানে হোয়াট ইজ ইট ? এটা কী ? এটা দর্শক উত্তর দেবে - তার যা মনে হবে তাই। এই কিমিতিকে অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট ভেবে অনেকে আলোচনা করেন কিন্তু তা নয়।" [৩৫]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে বিশেষ কোন লেবেলে বিশ্বাস করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ শিল্পের আশ্রয় নেয় জীবনকে বুঝতে এই কথার সমর্থন মেলে ইয়োনেস্কোর কথায়। "ইওনেস্কো ১৯৫৮ সালে কেনেথ টাইটানের বিরূপ সমালোচনার জবাবে লেখেন শিল্পের সঙ্গে তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, বাস্তবকে সরাসরি উপলব্ধি করার জন্য শিল্প নিজস্ব উপায় অবলম্বন করে।"[৩৬] তবে পরে তিনি তাঁর নাটকের লেবেল সম্পর্কে বলেছেন –

> 'কিন্তু আমার ক্রমশ মনে হলো আমার নাটককে যদি সত্যি কোন একটা লেভেল দিতে হয় তাহলে তাকে বলা যেতে পারে ম্যাজিক রিয়ালিজম।'[৩৭]

এই ম্যাজিক রিয়ালিজম এর ব্যাপার এসেছে তাঁর বহু নাটকে। ম্যাজিক রিয়ালিজম বা ম্যাজিক্যাল রিয়ালিজম, মার্ভেলাস রিয়ালিজম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল ষাটের দশকে

যার জার্মানে আবির্ভাব এবং পরে এটা এক আন্দোলনের আকারে সারা ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৃষ্টি হয় 'ডাডাবাদ' যা পরবর্তীকালে পরাবাস্তববাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়। ১৮৮৫-১৯০০ খ্রী: জার্মানির শিল্প আন্দোলনের জন্য 'এক্সপ্রেশনিস্ট বা প্রকাশবাদ' আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটময় পরিস্থিতিতে শিল্পীরা প্রকাশবাদে আস্থা রাখতে দ্বিধান্বিত। জার্মান শিল্প-সমালোচক ফ্রাঞ্চ রো ভাইমা প্রজাতন্ত্রের শিল্প আন্দোলনের আলোচনা সূত্রে প্রকাশবাদ ও 'পরাবাস্তববাদের' ভিন্নতা প্রদর্শন করতে গিয়ে 'জাদুবাস্তববাদ' বা 'ম্যাজিক রিয়ালিজমের' কথা বলেন। এই আখ্যাটি সম্ভবত জার্মান 'Magischer Realismus' থেকে এসেছে, পরে শব্দটি ডাচ ভাষায় অনূদিত হয় 'Magisch-realisme' একইভাবে স্পেনীয় 'realismo magico' এবং ইংরেজি 'magic realism' শব্দটি প্রচলিত হয়। লাতিন আমেরিকান জাদুবাস্তবতার প্রবক্তা বলা হয় কার্পেন্তিয়েরকে। যাদুবাস্তববাদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মিগুয়েল দে সাভেদ্রা সেরভান্তেস ও বিংশ শতাব্দীর চেক অস্ট্রিয়ান কাফকা, চিত্রে ইতালীয় চিত্রকর জিওজিয়ো দে চিরিক। অন্যদিকে জাদুবাস্তববাদী লেখককুলের শিরোমণি বলা হয় গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসকে। তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস 'শত বৎসরের নিঃসঙ্গতা' ম্যাজিক রিয়েলিজমের এক সার্থক দৃষ্টান্ত। জাদুবাস্তবতার আলোচনা সূত্রে ফ্যান্টাসির কথা আসে। কিন্তু দুটি ধারণা এক নয়। জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্চ রো ভাইমার শিল্প আন্দোলনের আলোচনা সূত্রে প্রকাশবাদী আন্দোলন ও পরাবাস্তববাদী শিল্পের পার্থক্য বিষয়ে আলোকপাট করতে গিয়ে ম্যাজিক রিয়ালিজমের বাইশটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। জাদুবাস্তবতার কয়েকটি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন রবিন পাল তাঁর 'জাদু বাস্তবতা : বাস্তবতার ভিন্ন স্বর' প্রবন্ধে। বৈশিষ্ট্য গুলি নিম্নরূপ : ১) বাস্তব, ফ্যান্টাসি, উদ্ভটের মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান। ২) চকিত সময় বদলের নৈপুণ্য। ৩) ন্যারেটিভ বা প্লটের বিভিন্ন অংশ একত্র পাকানো বা গোলকধাঁধা প্লট। ৪) স্বপ্ন, মিথ,

রূপকথা গল্পের নানাপ্রকার ব্যবহার। ৫) প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনা। ৬) রহস্যময় পাণ্ডিত্য। ৭) অবাক বা সহসা চমকের উপাদান। ৮) আতঙ্কময় ও অব্যাখ্যায়ের উপস্থিতি। ৯) এখানে থাকবে ফ্যান্টাসি ও অশিল্পিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব, সমাজবাস্তবের সমন্বয়, উদ্দেশ্য সেই সত্য সন্ধান যা প্রাত্যহিকতার আড়ালে থাকে। ১০) লেখক প্রকৃতিতে, মানব আচরণে সন্ধান করে চলেন এক লুকানো ক্ষমতা/শক্তি, বাস্তব এখানে ভাঙা, আর এই রদবদলের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে পৌঁছে যান পাঠক। ১১) জাদুবাস্তববাদী রচনায় চাবি-ঘটনার কেন্দ্রীয় কোনো কার্যকারণগত, মনস্তত্ত্বগত ব্যাখ্যা থাকে না। ১২) জাদুবাস্তববাদী পরিপার্শ্বের বাস্তব অনুসরণ না করে আড়াল থেকে বেরুতে থাকা রহস্যকে ধরতে চায়। ১৩) এই ধরনের রচনায় থাকে এক মহাকাব্যিক মাত্রা। ১৪) এই রচনার প্রবণতাই হলো ঐতিহাসিক, নৈতিক প্রেক্ষণ থেকে অতীতের সঙ্গে সংঘাতে নামা। ১৫) অনেক সময় থাকে এক কাল্পনিক নগর, সমাজ আর আখ্যানে ফুটে উঠতে থাকে এখানে মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য। ১৬) জাদুবাস্তববাদ সাহিত্য পরাবাস্তববাদী ফ্যান্টাসি মুখ্য সাহিত্য নয়, এর প্রবণতাই আলাদা। [৩৯]

যখন একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন চলছে ম্যাজিক রিয়েলিজম নিয়ে, তখন পৃথিবীর অপর প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গে বসে বাংলা ভাষায় নাটক চর্চা করছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিক রিয়ালিজমের শর্ত মেনে। এখানে আলোচ্য বিষয় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে তত্ত্বভাবনা। বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কথা মাথায় রেখে তাঁর নাটকে প্রতিফলিত তত্ত্বের আলোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রথম নাটক ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ ১৯৬৩ সালের ‘গন্ধর্ব’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যজগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নাটকের নামকরণ, অভিনব বিষয়বস্তু, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে পাঠকের মনে জাগতে থাকে নানা প্রশ্ন– এ কেমন ধরনের নাটক? ‘গন্ধর্ব’ সম্পাদকের নিবেদন ছিল–

"গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলার মতো, জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো, সুকুমার রায়ের ছড়ার মতো কিংবা আয়োনেস্কোর অসম্ভব সিচুয়েশন সৃষ্টির মত সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বাংলা নাটকটির রচয়িতা একজন কবি।"[৪০]

চার অঙ্কের এই পূর্ণাঙ্গ নব্য রীতির অনুসারী মৌলিক নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে– একজন অজ্ঞাতপরিচয় লোক তার অদ্ভুত একটা রোগ- গলায় সূর্য আটকে রয়েছে যা পৃথিবীর আদি রোগ বলে তার মনে হয়। লোকটি ডাক্তার দেখানোর জন্য এসে উঠেছে মিলুদের বাড়িতে। মিলুর বাবা ডাক্তার কিন্তু বিশেষ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছেন তিনি, ফিরতে দিন দশেক সময় লাগবে। বাড়িতে রয়েছে মিলুর বাড়ির কাজের লোক বনমালী এবং মিলুর প্রেমিক সমীর। আবার মিলুর জ্যাঠামনি ১৫-১৬ বছর পর মিলুদের বাড়িতে এসেছেন। তিনি রোগীর অদ্ভুত রোগের এক অদ্ভুত চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি চিমটে দিয়ে গলা থেকে সূর্যটাকে টেনে বের করে রাস্তায় গড়িয়ে কিংবা সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু তা হয় না লোকটির কাশির সঙ্গে অসংখ্য পিংপং বল বেরিয়ে ড্রপ খেতে খেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকটি নিঃসঙ্গ, একাকী। সমুদ্রে মাছ ধরা জালের টেনিস বলে চড়ে এসেছে লোকটি। সে কুকুরের মতো, আরশোলার মতো মরতে চায় না। সে বাঁচতে চায় তাই তো সে মিলুকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। লোকটিকে ধরার জন্য কালো পোশাক পরা ছায়ামূর্তির মত কয়েকজন মিউনিসিপ্যালিটির লোক সাঁড়াশি হাতে কুকুর ধরতে আসে। লোকটি নিজেকে কুকুর মনে করে আর মাঝে মাঝে কুকুরের মতো ডেকে উঠে। লোকটিকে মিলুরা বাঁচানোর চেষ্টা করে কিন্তু লোকটিকে তারা ধরে রাখতে পারে না। পরিশেষে দেখা যায় আগন্তুক লোকটি কাঁধে তার ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যায়।

নাটকটির তত্ত্বগত বিশ্লেষণী আলোয় বিচার করলে নাটকের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত তত্ত্ব ভাবনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। নাটকটির নামকরণ প্রসঙ্গ বিস্ময়ের। বাংলা নাটকে এধরনের উদ্ভট নামকরণ প্রবণতা স্বাভাবিকভাবে অদ্ভুত ঠেকে, যা প্রচলিত বাংলা নাটকের ধরায় অভিনব। নাটকের কাহিনি প্রচলিত প্রথা সর্বস্ব রীতির নিগড় ভেঙে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। কাহিনির অন্তর্বয়ন অশ্রুতপূর্ব অবাস্তব এক রোগগ্রস্ত অজ্ঞাতপরিচয় আগন্তুককে কেন্দ্র করে সূচনা থেকে নানা উদ্ভট আপাত ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করে। আগন্তুক (out sider) লোকটির কণ্ঠনালীতে একটি বড় মাপের সূর্য আটকে আছে, যে রোগটি লোকটির কাছে পৃথিবীর আদি রোগ বলে বিবেচিত। উদ্ভট রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আরো অদ্ভুত যদিও তা কেবল পরিকল্পিত, কিন্তু নাটকের মধ্যে তার প্রয়োগ হয়নি। এই কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকে যাওয়া প্রসঙ্গে ড. অরূপ রতন ঘোষ পৌরাণিক কাহিনি অর্থাৎ 'সমুদ্র মন্থনজাত অমৃত পান কালে দেবতা ছদ্মবেশী রাহুকে সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা চিহ্নিতকরণ এবং বিষ্ণু কর্তৃক সুদর্শন চক্রে মস্তকছেদন- অমৃত পানের ফলস্বরূপ মাথা-গলার অমরত্ব লাভ। সেই ক্রোধ বশত রাহু কর্তৃক সূর্যকে গ্রাস'[৪১]– এর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর পাশাপাশি তিনি আরও বলেছেন—

> "এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেবতা ও অসুরের চিরকালের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীতে সুবিধা ও সংগতি সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বঞ্চিত অসহায় মানুষদের মধ্যে যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের সম্পর্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে– এ নাটকে তা খুব সূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে। বঞ্চিত ও শোষিত মানুষেরা তাদের আত্মীয় নয় তারা যেন রাহুল মতো মারাত্মক শক্তিশালী সূর্যকে গিলে ফেলেছে এবং ঘটনাক্রমে অপেক্ষা করছে কখন তাদের গলা কেটে নিতে বা সূর্যকে বের করে নিতে দেবতাদের মতো সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা আসবে।"[৪২]

নামকরণ প্রসঙ্গটি পুরাণ প্রতিমায় প্রোথিত হলেও নাটকের বিষয় ভাবনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঊষর জমিতে – যেখানে মানুষ জটিল থেকে জটিলতর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে নির্বাসিত মনে করে। নাটকের কাহিনি যে আগন্তুক লোকটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত তার সকল পরিচয় হারিয়ে সে কেবল এক আগন্তুক লোক। পরিচিত জগতের মানুষের কাছে সে আউটসাইডার। মানুষের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে গিয়ে এমনই জটিলতম ও ভয়ঙ্কর অদ্ভুত জগতকে প্রত্যক্ষ করেছেন নাটককার। যেখানে অসঙ্গতি, অবিশ্বাস, অনিশ্চয়তা, নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতাবোধ-এ আক্রান্ত। নৈরাশ্য ও হতাশায় মানুষের জীবন সংশয়ান্বিত। জীবনের এই অসঙ্গতি, অবিশ্বাস, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ লোকটির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। সবকিছু সে ভুলে যায়। হারিয়ে যায় তার বেঁচে থাকার সকল অবলম্বন। লোকটি কুকুর কিংবা আরশোলার মতো মরে যেতে চায় না। তাইতো সে মিলুকে বিয়ে করে বেঁচে থাকতে চায়। লোক তাকে ভালবাসতে চায়। তার মতে ভালোবাসা সূর্যের চেয়েও ভারি। অবক্ষয়িত এই সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহার একমাত্র উপাদান প্রেমও পারে না লোকটিকে পৃথিবীর আদি রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে। কেননা ঈশ্বর তার কাছে অনেক আগেই অনাথ বলে চিহ্নিত, প্রতিভাত। যা নীৎসে কথিত ঈশ্বরের মৃত্যুর প্রতিধ্বনি স্বরূপ। ঈশ্বরের অনাথ হওয়া প্রসঙ্গে লোকটির মত— ‘একটা সমুদ্রে দেবতারা হাবুডুবু খাচ্ছে। কোন থাকবার জায়গা পাচ্ছে না। তারপর সেই অনাথ দেবতারা আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীরে ঢুকতে লাগল।’ লোকটি বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় বলেই সে মানসিক দ্বন্দে ভোগে, ভুল করে, বোকা হয়, ধূর্ত হয়, মূর্খ হয়। সে প্রচার করতে চায় কুকুরের দর্শন, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন। তাই লোকটিকে বলতে শুনি– ‘অদ্ভুত, নিজেকে খুঁজছিলাম। আত্মানুসন্ধান নয়তো! লাস্টলি এ ডগ্ রিয়ালাইজড– আত্মানং বিদ্ধি। দেন আই অ্যাম এ গ্রেট মেটাফিজিক্যাল ডগ্। আই অ্যাম টু প্রিচ ডগস ফিলসফি।...’ মাঝে মাঝে সে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ

করে ডেকে ওঠে যা মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়নকে দ্যোতিত করার পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের অবস্থানকে চিহ্নিত করে। অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় মানবিকতার অবমূল্যায়নে মানুষের মনুষ্যেতর জীব হিসেবে ভাবার চরম রূপ প্রকটিত হয় আয়োনেস্কোর 'রাইনোসেরাস' নাটকের চরিত্র গুলোর গণ্ডারে পরিণত হওয়া কিংবা কাফকার বিশ্ববিখ্যাত গল্প 'মেটামরফোসিস'-এ গ্রেগর সামসার একটি পোকায় রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে। বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকের মত এই নাটকেও কিছুই ঘটে না। লোকটি যে রোগ নিয়ে এসেছিল তাই নিয়েই সে ফিরে যায়।

প্লটের অগ্রগতি ঘটেছে লোকটির ভাবনা চিন্তার সঙ্গে অর্থাৎ সিচুয়েশন অনুযায়ী। এখানে প্লটের তুলনায় থিমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। আদি-মধ্য-অন্ত স্তরবিন্যাস এখানে অনুপস্থিত। এ নাটকের গঠন illogical, non-realistic। চরিত্রের ইনার-রিয়ালিটিকে ধরার চেষ্টা রয়েছে। অ্যারিস্টটল প্রদর্শিত time-space-action এই ত্রয়ী ঐক্য এখানে অনুসরণ করা হয়নি। সময় এখানে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই তিন কালে আবর্তিত। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একমাত্র মিলু ছাড়া বাকি সকল চরিত্র পরস্পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন উদ্ভট প্রকৃতির। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের মাসিমা চরিত্রের মতো মিলু চরিত্রেরা জগতের সকল নিয়ম মেনেই জীবন যাপন করে। তাদের জীবনে বিপর্যয় বলে কিছু নেই। তাদের জীবনের সকল কর্ম অভ্যাসের ফসল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পটভূমিতে তাদের এহেন আচরণ স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা স্পষ্ট হয় না। তাদের রিয়েলিটি আনরিয়েলিটির নামান্তর, এও অ্যাবসার্ড দর্শনের অনুসারী। 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে যে গণ্ডীর কথা বলা হয়েছে – সকল মানুষের সাথে সাথে মাসিমা- মিলুরাও সেই গণ্ডির মধ্যে ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান। 'মিথ অফ সিসিফাসে'র মতো এই চরিত্রগুলো যেন অভিশপ্ত সিসিফাসের মতোই মস্ত বড় পাথর গড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করছে পাহাড়ের চূড়ায়।

এই নাটকের চরিত্র গুলির 'অ্যাকশান' এর পাশাপাশি তাঁদের ভাষা ও অসঙ্গত, অযৌক্তিক, অবাস্তব যা পরস্পরের সঙ্গে কোন সংযোগ (communication) এর কাজ করে না। মিলু যখন লোকটিকে কিছু খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে, লোকটি তখন বলে – "না। পেট ভর্তি ক্ষিধে নয়, হৃৎপিণ্ড ভর্তি ক্ষিধে। নানা রকম ক্ষিধে। যেমন লাল খাওয়ার ক্ষিধে, সবুজ কিংবা রূপোলি খাবার ক্ষিধে... জলের উপরের বাতাস, অনেক দূরের বজ্রপাতের শব্দ, কাগজের মসৃণ স্পর্শ, জলে ভেজা কামিনী ফুলের গন্ধ, আপনার ঘাড়ের উপর গড়িয়ে পড়া চুল– এরকম অনেক কিছু খেতে চাই। হ্যাঁ, আর এখুনি আপনার চোখে যে ভয়, সেটাও খেতে চাই।"

কিংবা সমীরের প্রিয় কুকুর টমিকে নিয়ে লেখা কবিতা—

' টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
টমি টমি টমি
টমি টমি টমি ।'

যা অসঙ্গত অযৌক্তিক হাস্যকরভাবে উদ্ভট। পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটক গুলিতে এরকম উদ্ভট সংলাপের নিদর্শন কিছু কম নয়। যেমন আয়োনেস্কোর 'দ্য চেয়ার্স' নাটকে বৃদ্ধ ওরেটর ঘর ভর্তি কল্পিত লোকের সামনে অসংগত কিছু সংলাপ বলে।

এ নাটকে আরও বহু উপাদান রয়েছে যেগুলি অ্যাবসার্ড দর্শনের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো হাস্যরস পরিবেশন করা। এই হাস্যরস পরিবেশন করা হয় কখনো চরিত্রের ও আচরণের মাধ্যমে, আবার কখনো কথোপকথনের মাধ্যমে। জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তীব্র নৈরাশ্য থেকেই হাস্যরসকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকে এস্ট্রাগণের জুতো খোলার চেষ্টায়। এ ধরনের নাটকে হাস্যরস পরিবেশন দ্বারা ব্যঙ্গই করা হয় সমাজকে।

এখানে হাস্যরস কেবল অনাবিল হাসি বা হিউমার নয় পরিণতিতে অ্যারিস্টটল কথিত ‘ক্যাথার্সিস’- এর মাধ্যমে কোন আনন্দের সংবিদ দেয় না– বরং একটা শ্বাসরুদ্ধ অসহায় কম্পমান আতঙ্কের পরিবেশে স্থির করে রাখে। ‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’ নাটকে হাস্যরস পরিবেশনের নিদর্শন রয়েছে। নাটকের শুরুতে দেখা যায় মিলুর জ্যাঠামনিকে স্টেশন থেকে আনতে যাওয়ার জন্য সমীর যে পোশাক পরে তা দর্শক-পাঠকবর্গের হাসির খোরাক যোগায়। সে পরেছে খাকি হাফপ্যান্ট, ফুল হাতা টকটকে লাল গোল কিপারের মতো একটা গেঞ্জি, হাতে কালো রঙের একটা মুসলিম টুপি। এই পোশাকে তাকে অদ্ভুত লাগে। তাকে দেখে মিলু খিলখিল করে উত্তাল হাসি হাসে। এই সমীর চরিত্রের মধ্যে আরও নানা উদ্ভটের উপাদান রয়েছে। এই বিচিত্র পোশাক পরে তার মধ্যে ঘোর কবিত্ব জেগে ওঠে। তার কাছে জেঠুমনিকে আনার থেকে আজকের উপলব্ধি বড় বলে মনে হয়। আবেগে উত্তেজিত হয়ে বলে– ‘গরম বালির মধ্যে যেমন করে খই ফুটতে থাকে, তেমনি করে অজস্র কবিতা আমার মনে জাগছে। ব্যাঙের ছাতা খোলার শব্দের মতো আমি তার শব্দ শুনতে পাচ্ছ।’ শুধু তাই নয় যে ভালোবাসা মানুষকে দুর্যোগের, বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, তাতেও ভালোবাসা তার কাছে অসীম শক্তি বলে মনে হয়। এই ভালোবাসার জন্য সে করতে পারে না এমন কাজ তার কাছে নেই। সমীরকে বলতে শোনা যায়— ‘মনে হচ্ছে ভালোবাসার কী অসীম শক্তি! কেবল তোমার দুটি কথায় আমি এই চেহারায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আসতে পারি, স্টেশন তো ঘরের দরজায়। ভালোবাসা যদি চায় মেরুদণ্ড খুলে ফেলে ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, আরশোলা যা খুশি তাই হতে কোন লজ্জা নেই, ভালোবাসা যদি চায় সমস্ত ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ পোটলা করে মাথায় তুলে খালি গায়ে এসপ্ল্যানডের মোড়ে খড়ম পরে নৃত্য পর্যন্ত করে যেতে পারি। তুমি যখন ছোট্টটি ছিলে, পনের ছুঁয়েছ কি ছোঁওনি, তখনই এই মহাসত্য আমি টের পেয়েছিলাম। মনে আছে তোমাকে মনে রেখে লিখেছিলুম —

'আধফোঁটা কুড়ি তুমি দু চোখে কাজল
অলক দুলায়ে মোরে করেছে ছাগল।'

নাটকের এই অদ্ভুত সিচুয়েশান প্রসঙ্গে ফরাসি চিত্রপরিচালক জাঁ লুক গোদার একটি ছবি 'উইকেট এণ্ড' (১৯৬৮) এর তুলনা করেছেন ড. অরূপ রতন ঘোষ। ছবিতে দেখানো হয়েছে–

> 'হাইওয়ের ওপর ছুটি কাটাতে যাওয়া শহর বাসীদের মোটর গাড়িগুলি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ যানজটে পড়ে। যাত্রীদের অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির অংশ নিতে হয় দর্শকদেরও। দর্শকরা দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকা গাড়ি গুলিকে দেখতে থাকেন। পরে একসময় দেখানো হয় এই যানজটের প্রথমে অনেক দূরে একটি মোটর দুর্ঘটনা ঘটেছে। রক্তাপ্লুত একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে। দেখা যায় সেই যানজটে পর পর দাঁড়ানো দুটো ছাদ খোলা গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে একটা বল নিয়ে দুজন মাঝবয়েসী লোক লোফালুফি খেলতে থাকে। সময় কাটানোর জন্য এদের এই অদ্ভুত ব্যবহার ও বিশাল যানজট পশ্চিমী সভ্যতার জটিল এবং যানজটের মতই এক বিপর্যয়ের ছবি দেখায়।'[৪৩]

সেভাবে সমীর চরিত্রের অদ্ভুত আচরণ নাটকের অ্যাবসার্ডিটিকে প্রকট করে তোলে।

এছাড়া আর দেখা যায় যে লোকটি লস্টনেসে ভুগে। এই লস্টনেস উদ্ভট নাটকের বিশেষ লক্ষণ। এই লস্টনেসের বিশেষ দৃষ্টান্ত রয়েছে মিলু ও আগন্তুক লোকটির সংলাপে—

'মিলু।। আপনি কোথায় থাকেন?
লোকটি।। আপাতত কিছুই জানিনা।
মিলু।। এখানে আসবার আগে কোত্থেকে এলেন?
লোকটি।। আপনাদের এক তলার সিঁড়ি থেকে।

মিলু।। তার আগে?

লোকটি।। (গম্ভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করল, মাথা চুলকোলো, বিরক্ত হল) ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সিঁড়ির আগে, আপনাদের ক্লিনিকে, তার আগে রাস্তা।

মিলু।। তার আগে?

লোকটি।। তার আগে একটা টেনিস বলের উপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসেছি বলে মনে হচ্ছে।

মিলু।। নিশ্চয়ই তার আগের কিছু মনে পড়ছে না?

লোকটি।। হ্যাঁ পড়ছে। অন্ধকার, তার আগে অন্ধকার, তারো আগে অন্ধকার, আর আমি বিরাট একটা জাল হাতে করে হাঁটছি।'

এই অন্ধকার আসলে শূন্যতার কথা বলে। এই শূন্যতার দর্শন অ্যাবসার্ড নাটকের মূল থিম। সুতরাং নাটকের আঙ্গিক, বিষয় ভাবনা, সংলাপ, চরিত্র, সিচুয়েশন সকল উপাদানই অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণকে প্রকটিত করে তোলে। কিন্তু নাট্যকার নিজেই নাটকের তত্ত্ব ভাবনা প্রসঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটক বলার পক্ষপাতী নন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত —

> "কিন্তু অ্যাবসার্ড দর্শন আমার নাটকের নেই— শুধু বহিরঙ্গ দেখে অ্যাবসার্ড বলা যায় না, যে শূন্যতার দর্শন অ্যাবসার্ডে থাকে তা এতে নেই।... কিন্তু আমার ক্রমশ মনে হল আমার নাটককে যদি সত্যি কোন একটা লেভেল দিতে হয়, তাহলে তাকে বলা যেতে পারে ম্যাজিক রিয়ালিজম। আমি রিয়ালিজমকে একেবারে বর্জন করতে পারিনি। একটা সেটিং এর মধ্যে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি সামথিং ঘটল— অর্ডিনারির জায়গায় এক্সট্রাঅর্ডিনারি এসে ঢুকল ... তার লজিক অফ আল এবং চলছে এবং ক্রমশ সেই অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনাটা একটা মানে দিতে আরম্ভ করেছে মানুষের কাছে। যেমন ধরুন ১৯৬৩ তে লেখা

‘কণ্ঠনালীতে সূর্য’। তাতে আছে একটি ছেলে ডাক্তারের কাছে এল, তার অসুখ করেছে। গলায় সূর্যটা আটকেছে সেটা বেরোতে পারছে না। সে যখন চেষ্টা করে তার ভগ্নাংশ বেরিয়ে আসে পিং পং বলের মতো করে। ... এর মধ্যে এক মিডিয়কার আর্টিস্টের সমস্যাটাকে বোঝানো হচ্ছে। একজন মাঝারি মাপের শিল্পী অনেক বরো ভাবেন সূর্যের মতো, কিন্তু অতটা প্রকাশ করার শক্তি সামর্থ্য তার নেই। যখন সে প্রকাশ করতে চায় তখন ওই ভাঙা টুকরো সূর্যের মতো পিং পং বলের মত প্রকাশ করতে পারে। একটা চরম অসহায়ত্ব নিয়ে সে থাকে। বড়োকে বুকের মধ্যে ধারণ করে, কিন্তু লেখনীতে ধারণ করতে পারে না। এটা একটা ভীষণ কষ্ট। এই কষ্টটা নাটকের মধ্যে থাকতে থাকতে বুঝতে পারা যায়। তখন ছেলেটির ওপর সিমপ্যাথি আসে। এর মধ্যে শিল্পীর, মাঝারি মাপের শিল্পী যে যন্ত্রণা কাজ করছে তাকে সত্য বলে চেনা যায়। এই ভাবে শতকে চিনিয়ে দেয় ম্যাজিক রিয়ালিজম।” [৪৪]

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা চলে যে কণ্ঠনালীতে সূর্য নাটকের বহিরঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ আর নিহিতার্থে ম্যাজিক রিয়ালিজম। তবে অ্যাবসার্ড দর্শনের সার্বিক লক্ষণ ফুটে না উঠলেও কিংবা পাশ্চাত্যের অ্যাবসার্ড নাটকের মতো সার্বিক শুন্যতার কথা না বললেও তত্ত্বগত দিক থেকে অ্যাবসার্ডধর্মীতার লক্ষণ ধরা পড়ে। তবে বিষয় ভাবনাগত দিক থেকে একে ম্যাজিক রিয়ালিজমের নাটক বলা যায়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় নাটক ‘নীলরঙের ঘোড়া’ ১৯৬৪ সালে অক্টোবর মাসে ‘গন্ধর্ব’ নাট্যপত্রে শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাটকটি একটি বিদেশি গল্পের ভাবানুবাদ। ভিন্ন মাত্রার এই নাটকের কাহিনি পাঁচটি দৃশ্যে বর্ণিত। মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্ব সংকটের কাহিনি নিয়ে রচিত এই নাটক। পরিচিত জনদের সমাবেশের সম্পর্কের বুনট ও সম্পর্কের ভাঙ্গন একইসঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আপাত এক উদ্ভট

পরিবেশে। নাটকের প্রধান চরিত্র সোমনাথ। তাকে ঘিরেই নাটকের কাহিনি আবর্তিত। সোমনাথ, একজন প্রৌঢ়, চঞ্চল, সুহাস, বিমল, হ্যারি গোণ্ডেন, একটি বাচ্চা ছেলে, পর্ণা, মিলু মৃন্ময়ী– চরিত্রগুলি সম্বলিত এই নাটকের কাহিনিতে রয়েছে — তাসের তৈরি দীর্ঘ মালা গলায় একজন প্রৌঢ় একটি রহস্যময় পরিবেশের উপর দাঁড়িয়ে পরিচিতজনের সমাবেশে বক্তৃতার ঢঙে প্রশ্ন তোলেন আমরা হাসি কেন। সমাবেশে উপস্থিত চরিত্রগুলি সময় কাটানোর অন্য কোন বিষয় খুঁজে না পাওয়ায় এরকম বক্তৃতার আয়োজন করে। প্রৌঢ়ের কথায় আসলে তারা সকলেই এক প্যাকেট তাস মাত্র। যাদের হাতে নিয়ে অন্য কেউ খেলছে। এই সমাবেশের প্রধান অভ্যাগত সোমনাথ রায়। মিঠু ও পর্ণা এই দুই নারী যৌবনে সোমনাথকে ভালোবেসেছিল। সোমনাথ রায় একসময় নীল রঙের ঘোড়া স্বপ্ন দেখবে সেই ঘোড়াটা তাকে রেসের মাঠে নিয়ে যায়। সেখানেই তার সেই অনুভবটা সক্রিয় হয়ে ওঠে- 'হেলদি এনিম্যালস আর মুভিং'। ভীষণ থ্রিলিং ভাবনাটা। সোমনাথ এখনো স্পেকুলেশন করে কোন ঘোড়া মাঠে রেস জিতবে। সোমনাথের স্ত্রী মৃন্ময়ী, মেয়ে মিলু, ছেলে বিমল, প্রৌঢ় লোকটি এবং হ্যারি গোল্ডেন সকলেই সোমনাথকে উৎসাহ দেয় মাঠে রেস জিতে অর্থ উপার্জনের জন্য। কেবল পর্ণাই তাকে মাঠে যেতে মানা করে। কিন্তু যৌবনের স্বপ্ন তাকে ছাড়ে না। আশ্চর্যজনক ভাবে একটি শিশু সোমনাথের হাতে কাগজের টুকরো দিয়ে যায় যাতে লেখা থাকে আগামীকাল মাঠে কোন ঘোড়া জিতবে। অনেক অর্থ পেয়ে যায় সে। কিন্তু তার মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে ভেতরে ভেতরে। তাই তাকে বলতে শোনা যায়– 'আমরা তিনজনে যদি মন্দির, পাহাড়, সমুদ্র বা আকাশের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই তাহলে আবার তিনটে সবুজ পাতার মত ডালে একসঙ্গে আলো বাতাসে হয়তো এখনো বাস করতে পারি।' মাঠে রেস জিতে সোমনাথ বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েও তার মনে হয় সে যেন সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে। ঘরে আসবাবপত্রের বিবিধ উপকরণ কিন্তু মূল্যবান কিছু যেন খোয়া গেছে তার। সে মনে করে হাত থেকে কররেখা হারিয়ে যাচ্ছে। মাঠের গোড়ার লেসের

ফলাফলের মতো একই ভাবে বাচ্চা ছেলেটির দেওয়ার রঙিন কাগজ দেখে জানতে পারে তার মৃত্যুর আগাম বার্তা– আগামী শনিবারে মারা যাবে সে। মৃত্যুর পর সোমনাথের পরিচিতজনেরা প্রৌঢ়, মিঠু, পর্যায়ে, হ্যারি, সুহাস সকলে প্ল্যানচেট করে নীল রঙের ঘোড়ার স্বপ্নকে জানতে চায়। তারা জানতে চায় মৃত্যু তার কাছে কেমন লাগছে।

এখানে একজন মানুষের যাপিত জীবন এবং তার স্বপ্ন জীবন দুটোই সে বহন করে চলে। এমন কোন জীবন নেই যে স্বপ্নহীন, আবার এমন কোন জীবন নেই যে বাস্তবের মাটিতে পা না রেখে চলে। এ দুটোর ব্যতিক্রম হলে মানুষকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কাজেই সোমনাথের দুটি জীবন মিলে তার প্রকৃত জীবন। বাস্তব আর পরাবাস্তব (সুররিয়ালিজম) দুটোই সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত এই নাটকে। রিয়ালিজম এবং সুরিয়ালিজম এর সংমিশ্রণে ম্যাজিক রিয়ালিজমের সৃষ্টি। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই ম্যাজিকের দ্বারস্থ হন শিল্পী সাহিত্যিকগণ। একটি বাচ্চা ছেলের দ্বারা রঙিন কাগজে আগাম সবকিছু জেনে যাওয়া জাদুর মত অবাস্তব কল্পনা। সোমনাথের চিরজীবনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটে এই ম্যাজিক কল্পনার দ্বারা। তাছাড়া নাটকের মধ্যে নানা অদ্ভুত উপাদানের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। নাটকের শুরু এক রহস্যময় পরিবেশে পরিচিত পরিবারবর্গের সমাবেশে একজন প্রৌঢ়ের টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত প্রশ্নের দ্বারা– 'আমরা হাসি কেন?' প্রশ্নটি যেমন অদ্ভুত তেমনি তার গলার মালাও উদ্ভট দেখায়, যা হাস্যোদ্রেক করে। এই প্রৌঢ়ের মধ্যেই সোমনাথ মৃত্যু পরবর্তী আত্মা জাগ্রত হয় প্ল্যানচেটের মাধ্যমে। তাছাড়া সময় কাটানোর জন্য বিষয় খুঁজে না পাওয়া কর্মচঞ্চল যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের কথা বলার সীমিত সময় এবং বিষয়কে দ্যোতিত করে। ক্রিকেট খেলার অনুষঙ্গে কুড়ি বছর বা ত্রিশ বছর দূর থেকে বলে এসে বুকে আঘাত করা অতীত স্মৃতির রূপান্তর। সোমনাথ চরিত্রের সংকটে 'ব্ল্যাক আউট অফ কমিউনিকেশন' ফুটে ওঠে। সোমনাথ চরিত্রটি এখানে পুরোমাত্রায় আউটসাইডার

নয়, কিন্তু নাটকে তার প্রথম প্রকাশ আগন্তুক হিসেবে, কারণ সে সমাবেশের প্রধান অভ্যাগত। নাটকের প্রথমেই দেখা যায় সুবাসের ব্যাট থেকে এক কাল্পনিক বল কুড়ি বছর দূর থেকে এসে সোমনাথের বুকে আঘাত করে। এই আঘাত আসলে সোমনাথের জীবন থেকে পর্ণার হারিয়ে যাওয়ার রূপক। সোমনাথ ও পর্ণার প্রেম সুহাসের কারণেই ভেঙে যায়। এখানে সোমনাথ চরিত্রটি বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত। সোমনাথের গ্রুপ ফটো তোলার ইচ্ছা আসলে তার বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতার জাল থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা। সে শ্রেণিচ্যুত হয়ে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি। নিজের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ছিল না বলেই বিপুল অর্থের নেশায় মোক্ষলাভের স্বপ্ন দেখেছিল সে। এই স্বপ্ন উচ্চাকাঙ্খার প্রতীকমাত্র। বাচ্চা ছেলের হাতের রঙিন কাগজে লেখা বিজয়ী ঘোড়ার নাম এবং স্পেকুলেশন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রূপদানের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। ঘটে যায় এক্সট্রাঅর্ডিনারি সামথিং। এখানেই ম্যাজিক রিয়ালিজম অধিকমাত্রা লাভ করে। নাটকের ঘটনা সিচুয়েশন অনুযায়ী। নাটকের ঘটনা তিন কালে আবর্তিত– অতীত জীবনের কাহিনি এখানে গুরুত্ব পায়। একই সঙ্গে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎও কার্যকরী। গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার সম্পর্ক অর্থনীতি কেন্দ্রিক। এই অর্থকেন্দ্রিক সম্পর্ক অনেকটাই স্বার্থ কেন্দ্রিক। ফলে জীবনের জটিলতা, সংকট বেশি মাত্রায় কাজ করে। প্রত্যেকের সেলফ আইডেন্টিটি (আত্মপরিচয়) ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকে যে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটিকে মিলু সমীরের ঘরে ঢুকতে দেন, তারই যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পাই এই নাটকে। যেখানে শনিবার ও রেসের মাঠ প্রতিভাত হয় সকাল হওয়ার লগ্নে এক প্রৌঢ় চরিত্রের গাঢ় বাসনায়— "কোথায় ছেড়েছে? ও স্পেকুলেশন ছাড়েনি। স্টাডি ছাড়েনি ইনটুইশন, লাক, থ্রিল– সব মিলিয়ে লাইফ। হেলদি অ্যানিম্যালস আর মুভিং ও হোয়াট এ গ্লোরিয়াস সাইট! বিটার পাস্ট একটা ভাঙা মারবেলের মতো গড়াতে গড়াতে নর্দমায় হারিয়ে যাবে।" এখানে প্রৌঢ় চরিত্রটি সোমনাথ রায়ের বর্তমান সত্তা হয়ে ওঠে। এছাড়া নীলরঙের

ঘোড়ায় একটি চরিত্রের রেস খেলতে যাওয়া এবং তার উপলব্ধি এক যন্ত্রণায় কাতর করে। রেসের মাঠের সব থেকে বাস্তবতা যে অনিশ্চয়তা তাকেই ভিন্নভাবে ছিন্ন করে এই চরিত্র। কারণ সে জানতে পারে কোন ঘোড়া দৌড়ে জিতবে। এই চরিত্রকেও স্থির কতকগুলি চেনা রেখায় ভাবা সম্ভব হয়। এখানে ইনার রিয়ালিটির কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে চেতন ও অবচেতনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকটের পাশাপাশি হতাশা, নৈরাশ্যকে ধরার চেষ্টা করেছেন নাটককার। সোমনাথের কথাতেই তা স্পষ্ট— 'কিন্তু এক এক সময় নিজেকে বড় ক্লান্ত লাগে।... কিন্তু আমার উপর ভরসা করো না তোমরা। ভিতরে ভিতরে বড় ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছি আমি। এক এক সময় কার উপর জানিনা প্রচণ্ড রাগ হয়। কাঁধে যেন একটা ভারী বোঝা বইছি। বুকের মধ্যে একটা দানো যেন হাপাচ্ছে, কষ্টের, না সুখে, না উত্তেজনায় বুঝি না। হাত শক্ত করে মুঠো করতে ভয় করে। মনে হয় শব্দ করে মুঠোর মধ্যে একটা বোমা ফেটে যাবে।' লিরিকধর্মী এই সংলাপ নাটক ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। সুতরাং উপরের প্রেক্ষিতে এ কথা বলা চলে যে, বাস্তব আর স্বপ্নের মিলনে কল্পিত এক কাহিনির অন্তর্বয়ন, নাটকের আঙ্গিক রচনায় নাটককার অনেক সময় অ্যাবসার্ড দর্শনের অনুসরণ করেছেন। এখানে রিয়ালিজম, সুররিয়ালিজম আইডেন্টিটি, ক্রাইসিস, সম্পর্কের জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষুব্ধ সমাজ সমালোচনা, অবাস্তব কল্পনা, হাস্যরস পরিবেশন, কাব্যধর্মী সংলাপ প্রভৃতি উপাদান এবং প্রতীক ও ব্যঞ্জনায় নাটকের নিহিতার্থ পরিবেশনে নাটককার যে নাট্যতত্ত্বের অনুসরণ করেছেন তা আংশিক অ্যাবসার্ডধর্মী। তবে রিয়ালিটি ও স্বপ্ন তথা কল্পনার মেলবন্ধন ঘটাতে তিনি ম্যাজিক রিয়ালিজমের অনুসরণ করেছেন অধিকমাত্রায়। সেদিক থেকে তত্ত্বগত ভাবনায় এ নাটক ম্যাজিক রিয়ালিজমের দৃষ্টান্ত। এই বাস্তবতা এবং কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তাঁর বহু নাটকে, যা ম্যাজিক রিয়ালিজমের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। এ ধরনের নাটক হল 'তোতারাম', 'মুষ্ঠিযোগ', 'লাঠি' প্রভৃতি।

'তোতারাম' নাটকের কাহিনিতে দেখা যায় - পাপ-পুণ্য বোধ সম্পন্ন ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে সদাসতর্ক সৎ সবজি বিক্রেতা তোতারাম সহজ সরল ভাবে জীবন কাটাতে চায়। তোতারাম বিশ্বাস করে সবজি বিক্রেতা হিসাবে ক্রেতাকে ঠকানো পাপ। এই মানুষটাই স্ত্রী ময়ূরী ও শ্যালক ভজুর প্ররোচনায়, অবস্থার চাপে বক্সীবাবার দেওয়া মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা পাপের সঙ্গে আপোষ করে। স্ত্রীকে সুখী করতে বাবাজী সেজে লোক ঠকাতে শুরু করে। কাকতালীয় ভাবে কতকগুলি ঘটনার সংঘটনে তোতারাম অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। চারিদিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়লে পর রাজদরবারে রাজজ্যোতিষ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ আসে। রাজা তাকে রাজজ্যোতিষ বলে ঘোষণা করলেও তোতারাম এই পদের পরিবর্তে রাজার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। সে তার অর্জিত ধনসম্পত্তি দিয়ে একটা অন্নসত্র খুলতে চায়– যেখানে নগরের নিরন্ন উপোষী মানুষ এলে তাদের সঙ্গে দু-মুঠো খেতে পারে এবং সে যেন এই কাজ সর্বশক্তি দিয়ে করতে পারে। 'রাজরক্ত' পূর্ববর্তী নাটকে মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে নাট্যরীতি গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তীকালের নাটক রচনায় তিনি সরে এসেছিলেন। 'তোতারাম' নাটকে তিনি দেশীয় লোকজফর্ম ব্যবহার করলেন। বাস্তব আর জাদু তথা মন্ত্র-তন্ত্র নাটকের আখ্যানবস্তুতে প্রাধান্য লাভ করে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতপূর্ণ নাট্যাঙ্গিকের মাধ্যমে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'তোতারাম' নাটকে তাঁর সমকাল ও সামাজিক সমস্যা সংকটকে শিল্পীত ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেছেন নাটককার – এ নাটকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী শিল্পী মাত্রই মানব কল্যাণকামী। 'তোতারাম' নাটকে তোতারাম চরিত্রের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যবোধও চারিত্রিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের শুভ হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।'তোতারাম' নাটকে মানবিক মূল্যবোধের কাহিনি বর্ণিত। অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় মানবিক

মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন তোতারাম চরিত্রের মাধ্যমে। এই নাটকের কাহিনি, সংলাপ আঙ্গিক ভবনায় যে তত্বগত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা অধিক মাত্রায় ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু বাস্তবতার অনুসারী।

'মুষ্ঠিযোগ' নাটকে তিনি মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকা শক্তি জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির অকারণ ভয় কাতর শক্তির বিকাশের দিকে মন দেয় না। ফলে জাগতিক দিক থেকে অন্তহীন হয়ে ওঠে তার দুর্দশা। এই নাটকটিতে নাটককার দেখিয়েছেন' মানুষের জীবনে সফলতার একমাত্র পথ হচ্ছে নিজের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। ঢিসুম ঢিসুম নাটকের নায়ক যদুপতি মধ্যবিত্ত মানুষ। তার স্বভাব দুর্বল। বাস্তবে সে তার বিরোধীদের আক্রমণ করতে পারত না তাই ঘুমের মধ্যে সেই কাজটি সেরে নেয়। হঠাৎ এসে যায় এক ফকির, তার দেওয়া বড়ি খেয়ে যদুপতি নিজের মধ্যে অনুভব করে এক অলৌকিক শক্তি। আর তাকে সাহস যোগায় বাল্যবন্ধু নিতাইয়ের অশরীরী কণ্ঠস্বর। পরিণামে দেখা যায় তার কাছে পরাস্ত হচ্ছে দুর্ধর্ষ গুণ্ডা ভাট্টা আর জগা মিত্তির। বস্তুত প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে নিহিত শক্তি। মানুষ সেই শক্তি সম্পর্কে সচেতন নয়। অথচ সেই শক্তি একদিন জাগ্রত হবেই। প্রত্যেকটা মানুষ এমনকি যদুপতির মত অপদার্থ একজন মানুষও পৃথিবীতে আসে একটা মিরাক্কেল ঘটাতে। একটা মুহূর্ত জীবনে আসবেই তখন তুচ্ছ একটা সাধারণ মানুষও অসাধারণ হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যদুপতির অন্যত্র বদলি বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার দজ্জাল স্ত্রীও বশ মেনেছে। এভাবেই নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানুষের নিজস্ব শক্তি সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। হয়তো নাটককার সমকালের বাঙালি চরিত্রে ভয়ের আধিক্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি মানুষের কাছে পৌঁছানো সহজ ও সক্রিয় মাধ্যম নাটকের মধ্য দিয়ে চেয়েছেন এই জাতিগত দুর্বলতার বিলুপ্তি ঘটাতে। এই আত্মশক্তি জাগরণে জাদু বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নাটককার।

মানসিক অবসাদ কাটিয়ে মনুষ্যত্ত্বের জয়গানের নাটক 'লাঠি'। হরিপ্রসাদ, রতন, সুখেন, ঘোষ, অন্নদা ও নীলে এই ছটি চরিত্রের মধ্যে কাহিনি আবর্তিত। হরিপ্রসাদ নিতান্তই সাধারণ এক কর্মচারি। একদিন অফিস থেকে বেরোবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বন্ধুর কাছে অফিসের মালিক ঘোষ সম্পর্কে ছোট মুখে বড়ো কথা বলে ফেলে। সে অফিসের মালিক ঘোষের বাপকে চাষা আর ঘোষকে জানোয়ার বলে। এই পেছন থেকে স্বয়ং মালিক এই কহা শুনে ফেলা থেকেই হরিপ্রসাদ উদাসীন হয়ে থাকে। কারোর সঙ্গে কোনো কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। সে অফিস কামাই করে। তার ছেলে রতন তার বাবার অফিসে না যাওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে পারে। খবর জানার পর থেকে বাড়ির সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সকলের অনুরোধে এবং মালিকের সমন ধরানোর কারণে হরিপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত মালিকের বাড়িতে ক্ষমা চাইতে যায়। বসবার ঘরে মদ খাওয়ার সময় মালিক ও তার বন্ধু সুখেন অপমান করার খেলায় মেতে ওঠে। চেয়ারে উঠে কান ধরে থাকায় তবেই অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পায়। চরম অপমানে ভেঙে পড়ে হরিপ্রসাদ। এই চরম অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের রুখে দাঁড়াতে বাড়ির সকলে বলে। এতে হরিপ্রসাদ নিজের ভিতরে বাঘের মত শক্তি অনুভব করে। পরদিন সকালে সে মালিকের বাড়ি গিয়ে নিজের পায়ে জোর পাওয়া লাঠি দিয়ে জানোয়াররূপী মালিককে উচিৎ শিক্ষা দেয়। পায়ে ভর করে দাঁড়ানো লাঠিকেই সে প্রতিবাদের হাতিয়ার করে তোলে। এই লাঠির জোরেই সে ভয়কে জয় করে। হরিপ্রসাদের মধ্যে ভয়কে জয় করার জন্য হঠাৎ করে তার মধ্যে কোনো এক জাদু যেন কাজ করে। এই 'Magic if'-এর কথাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন নাটককার তাঁর এই নাটকে। নাটকটির মধ্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের উপাদান প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৬৪ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় নাটক 'মৃত্যুসংবাদ' নক্ষত্র নাট্যদলের প্রকাশনায় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। আইরিস নাট্যকার জন মিলিংটন সিঞ্জ এর 'দি প্লে বয়

অফ দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড' (The Play Boy of the Western World) (১৯০৭) নাটকের অনুপ্রেরণায় লেখা। আংশিকভাবে ঘটনাগত মিল থাকলেও এর সমস্যা, চিন্তা, অনুভব, কল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক। কোন চরিত্রে দর্শন সিঞ্জ এর ভাবনার অনুসারী নয়। ১৯৬৫ সালে নক্ষত্র নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত করে। নাট্যকার নিজে নাটকটিকে বাংলায় অভিনীত প্রথম মৌলিক নাটক বলে চিহ্নিত করেছেন।

কাহিনি বিন্যাসের দিক থেকে তিন অঙ্কের এই নাটকটি একটি মফস্বল শহরের বড় পটভূমিতে লিখিত। নাটকের বিষয়বস্তু রয়েছে, বুলু নামক একটি মেয়ের সামনে বি.এ. পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও পাড়ার ছেলেদের আয়োজিত স্পোর্টসের উৎসাহ, উচ্ছ্বাস ও অনুরোধে-আবদারের তাদের স্পোর্টসের কার্ডে নাম লিখে দেয়। বাড়িতে সে একা। সুবোধ নামক বোকা ভীতু শান্তশিষ্ট যুবক তাকে ভালোবাসে। সব কিছুতে সুবোধের ভয়। বুলু তার এই ভয়টা ভাঙতে চায়। বুলুর বাড়ির সকলে বিয়ে উপলক্ষে মিরাট গেছে। সুবোধ বুলুর বাড়ি থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলায় একটা ছায়ামূর্তি দেখে ভয় পায়। হঠাৎ সে এসে বুলু ও ইতিমধ্যে আগত বুলুর বাবার বন্ধু ষাট বছর বয়স্ক নীরেন কাকুকে খবর দেয় যে, সে রেল লাইনের ধারে একটা মৃতদেহ দেখে এসেছে। তবে লোককে জীবিত না মৃত তা সে ভালো করে দেখেনি। নীরেনকাকু কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। সে মনে করে তার বেঁচে থাকাটা একটা মিশনের জন্য। তার বড় একটা কাজ বাকি আছে। তবে কাজটা কি সে তা জানে না। ছায়ামূর্তির লোকটিকে সে খোঁজ করতে চায়। হঠাৎ এক আগন্তুক লোক এসে ওদের ঘরে ঢোকে। সুবোধ বুলুর কথায় উত্তেজিত হয়ে কার্তুজ বিহীন বন্দুক নিয়ে যে লোকটিকে খুঁজতে বের হয়, সেই লোকটি সুবোধের কলার ধরে টেনে আনে। সুবোধ লোকটিকে খুনি ডাকাত বলার জন্য লোকটি হঠাৎ রেগে গিয়ে অদ্ভুত সংলাপ বলে। লোকটির হাবভাব অদ্ভুত। লোকটি কিছু করতে পারে না। গরমেও তার শীত করে। বুলুকে ঘিরে একটি প্রজাপতিকে উড়তে দেখে তার মনে হয় তার মাথা থেকে রঙিন

প্রজাপতিক বেরিয়ে গিয়ে ভীমরুল ঢুকে পড়েছে। ভিমরুলাটি লোকটির মাথা-হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করে। সে তার বাবাকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। মা বাবা তাকে খুব ভালোবাসত, তবুও একটা দুঃস্বপ্নের ঘরে সে তার বাবাকে হত্যা করে। পৃথিবীর উপর রাগ থেকেই সে এই কাজ করেছে। নীরেন কাকু লোকটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীরের আখ্যা দেয়। বাকি অন্যান্য সকল চরিত্র তাকে সমর্থন করে। লোকটির সংলাপ তাই স্বপ্ন ও বাস্তবের সমন্বয়ে অযৌক্তিক, অসংগত ও অদ্ভুত হয়ে ওঠে। সে নিজের নাম বলতে পারে না। যুব সম্প্রদায়ের কাছে 'জায়ান্ট ফিগার' হয়ে ওঠে। লোকটির প্রতি বুলুর আগ্রহ সুবোধের ঈর্ষার কারণ। এদিকে লোকটির বাবা খুঁজতে আসে। আসলে লোকটির বাবা মারা যায়নি। বাবাকে হত্যা করার ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন, একটা ধারণামাত্র। লোকটি বিশ্বাস করে সে বাবাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হাতুড়ি মেরে হত্যা করেছে। লোকটি স্পোর্টসে অনেক পুরস্কার পায়, তাই তাকে নিয়ে ছেলেরা হইচই করে। লোকটির বাবা লোকটিকে স্কুল বানানোর, ব্রিজ বানানোর স্বপ্নের লোভ দেখিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। প্রৌঢ় লোকটির সঙ্গে বুলুর কথায় জানা যায়, তার ছেলে স্বাভাবিক জীবনের নিয়মে অভ্যস্ত নয়। লোকটি শূন্যতার অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম বীজ বানানোর স্বপ্ন দেখত। বাবার দেখানো লোভে বাড়ি ফিরতে চায় না সে। অনেক কথা কাটাকাটির পর লোকটি তার বাবাকে আবার খুন করতে যায়। বাবাকে হত্যার জন্য সে শুধু নিজেকে নয় সবাইকে, কমিউনিটিকে, গড়, ম্যান সবাইকে দায়ী করে। কিন্তু বাবা একবারও মারা যায়নি। শেষ পর্যন্ত লোকটি তার বাবার সঙ্গে চলে যায়। সবাই চলে গেলে বুলু একাকী হয়ে পড়ে।

নাটকটির প্লটের অগ্রগতি হয়েছে আগন্তক লোকটির অদ্ভুত ভাবনা চিন্তা ও অদ্ভুত সংলাপের দ্বারা অর্থাৎ সিচুয়েশন অনুযায়ী। লোকটির বাবাকে হত্যা করার ভাবনা আনরিয়েল হয়ে ওঠে। এই রিয়েল এবং আনরিয়েল এর দ্বন্দ্বই প্রকট হয়েছে এ

নাটকে। পুরো নাটকটিতে অ্যাবসার্ড উপাদান লক্ষ করা যায়। নাটকের অ্যাবসার্ডিটি প্রসঙ্গে নাটককার বলেছেন —

> "বিষয় ও বিন্যাসের দিক থেকে মৃত্যু সংবাদ সমকালে কিছু অভিনবত্ব হয়তো দাবি করে। আপাত অবিশ্বাস্য ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে লস্টনেস, অস্তিত্বের অর্থ ও অর্থহীনতা, ভালোবাসা, আস্থার অভাব, পিপাসা, বাঁচার উল্লাস ও বেদনা, হত্যা ও আত্মহত্যার কারণ ইত্যাদি বিভিন্ন বুদ্ধিগত এবং অনুভব প্রধান জিজ্ঞাসা মৃত্যু সংবাদে তীব্রতা লাভ করেছে। এর নায়ক নিজের নাম হারিয়ে ফেলেছে। তার নাম নেই, পরিচিত জীবনের মানুষের কাছে তাই সে আগন্তক, আউটসাইডার। তার কথা বেদনা উল্লাস যন্ত্রণা আনন্দ তাই গতানুগতিক মানুষের কাছে কখনো কৌতূহলের, কখনো বিপদজনক, কখনো রহস্যময়। লোকটি আমাদের মনের অবচেতন অঞ্চলের অন্ধকার থেকে শূন্যতা, অর্থহীনতা এবং অনর্থক অস্তিত্বের কাঁটায় রক্তাক্ত হয়ে বাইরে এসেছে। তার মন থেকে সুন্দর, ভালোবাসা এবং বাঁচার আনন্দ হারিয়ে যায়নি। সে বাঁচতে চায়, আর এই চরিত্র তার নিজের মতো করে বাঁচতে গেলে আত্মায় যে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত, অন্ধকারের উদ্দাম প্রতিবন্ধকতা তার রূপ নাটক রয়েছে। পাশাপাশি জীবনের শুভ ও সুন্দরের সহযোগিতাও বর্তমান। সুন্দর ও শূন্যতার মধ্যবর্তী আবর্তভূমিতে মৃত্যুসংবাদের নায়ক রক্তাক্ত, তীব্র জীবন পিপাসায় কম্পমান।"[৪৪]

অর্থহীনতার মধ্য থেকে অর্থ খোঁজার চেষ্টা অ্যাবসার্ড দর্শনের একটি অন্যতম উপাদান বা বৈশিষ্ট্য। এই নাটকে আগন্তুক লোকটি ও বুলুর কথার মধ্যে তা প্রতিফলিত—

‘লোকটি: ... আমার বাবা-মা এরাই তো আমাকে অনর্থক নিয়ে এল। পৃথিবী কি নিষ্ঠুর খেলা খেলছে আমাকে নিয়ে। আমার বাবাই তো দায়ী। মা থাকলে তাঁকেও দায়ী করতাম। আমি মরে যেতে পারতাম– বাবা আমাকে ঘিরে রেখে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে আরও ভয়াবহ অস্তিত্বের অগ্নিকাণ্ডে আমাকে দিনরাত পোড়াবে বলে। বাবা, আমার বাবাই সব অস্বস্তির মূলে। ওই প্রৌঢ় লোকটি স্নেহের ছাতা ধরে আমাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে যেতাম এক-একদিন। অসহ্য মুহূর্তে প্রতিদিন মেরে ফেলতে চেয়েছি, পারিনি। শেষ পর্যন্ত পারলুম। আজ আমি মুক্ত, পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার শোধ নিয়েছি।

বুলু: পৃথিবীর আর সব খুনীর থেকে কিন্তু আপনি আলাদা। খুনের মধ্য দিয়ে আপনি একটা অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন, তাই না?

লোকটি: ঠিক বলেছেন আপনি।’

কাহিনির নায়িকা বুলু। সহানুভূতিশীল মেয়েদের জগৎ তাকে গ্রাস না করলেও প্রধান চরিত্রটি যখন উদ্ভট অথচ সত্য জীবন সমস্যা নিয়ে তার কাছে এলে ব্যাপারটাতে সে একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। প্রতিদিনকার স্বাভাবিক জীবনকে ও আপাত উদ্ভট যুক্তিহীনতার ভিতরের সত্যকেও মানতে হয়। লোকটির বাবাকে হত্যা করা আসলে একটা উদ্ভট কল্পনা-একটা ফিলসফিক্যাল ব্যাপার যা আলবেয়ার কাম্যুর ‘ফিলসফিক্যাল সুইসাইড’-এর কথাকে স্মরণ করায়। কাম্যুর কথায় সমকালীন পৃথিবীর জীবন যাপনের বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের আত্মহত্যা করা উচিত। কিন্তু আত্মহত্যা না করে, অভিশপ্ত সিসিফাসের মতো মাথা উঁচু করে অর্থহীন জীবন অতিবাহিত করতে হবে। কাম্যুর কথায় —

> "The fundamental subject of the myth of sisyphus is this : it is legitimate and necessary to wonder weather life has whether life has a meaning; therefore it is legitimate to meet the problem of suicide face to face. The answer, underlynig and appearing through paradoxes which cover it, is this : even if one does not believe in God, suicide is not legitimate; Written fifteen years ago, in 1940 amidst the French and European disaster, this book declares that even within the limits of nihilism it is possible to find the means to proceed beyond nihilism. In all the books I have written since, I have attempted to pursue these direction. Although The Myth of Sisyphus poses mortal problems, it sums itself up for me as a lucid invitation to life and to create, in the very midst of the desert."[৪৫]

এ নাটকেও নীরেন কাকুকে বলতে শোনা যায় — 'আমাদের উচিত সমবেত আত্মহত্যা। অর্থহীন জীবনের মানুষগুলো সব একটা বিরাট উৎসবের মতো করে মরবে।' বাবাকে হত্যার ধারণাটিকে বুলু ও নীরেনকাকু শ্রদ্ধার চোখে দেখে। নীরেনকাকু একে মানুষের প্রবলতম বিদ্রোহ ও লোকটিকে শ্রেষ্ঠ বীর ও নায়ক বলেন। বুলুর মতে লোকটির মধ্য দিয়ে সত্যিই এই পৃথিবীর প্রথম বিদ্রোহের জন্ম হয়েছে। এ নাটকের একমাত্র সুবোধ চরিত্রটি সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক কথা বলে। নীরেনবাবু লোকটি বারকয়েক আত্মহত্যার চেষ্টা করেও কিন্তু ব্যর্থ হয়। তিনি মনে করেন তার বেঁচে থাকার একটা মিশন রয়েছে। তাছাড়া এ নাটকে রয়েছে ঈশ্বরের মৃত্যু সংবাদ। ঈশ্বরের সব দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা। বস্তুত নাটকে নীৎসের মতো বার বার ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করা

হয়েছে। লোকটি তার পিতাকে অর্থাৎ তার স্রষ্টাকে যিনি সৃষ্টিকর্তার অনুরূপ- তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে, সে হত্যা করেছে। এই ঈশ্বরের মৃত্যু সংবাদ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং এটি অ্যাবসার্ড নাটকের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই নাটকে আরও বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অ্যাবসার্ড নাটক অনুসারী, যেমন লোকটির কোনো পরিচয় নাটকে নেই সে আউটসাইডার। সে লস্টনেসে ভোগে। সে তার নিজের নাম ভুলে যায়। তার সংলাপ অদ্ভুত, উদ্ভট। বাস্তব জীবন বা জীবন যাপনের অর্থহীনতাকে অনেক অ্যাবসার্ড নাটক তুলে ধরেছে। এই নাটকের অনেক ঘটনা আধুনিক জীবন যাপনের এক গভীর শূন্যতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এখানে গোল বেলুন শূন্যতার পাশাপাশি পৃথিবীকেও প্রতীকায়িত করে। আবার বেলুনের প্রতীক ছেড়ে এই শূন্যতা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে আগন্তুক লোকটির পিতা প্রৌঢ় চরিত্রের ব্রিজের নকশা তৈরির মধ্য দিয়ে। প্রৌঢ় লোকটির কথায় – " শূন্যতা থেকে সুন্দর, একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত – এই যে দেখুন, এখানে একটা অন্ধকার আছে। ... কালো মানে হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত হারিয়ে যাওয়া রঙের শূন্যতা। এই শূন্যতা থেকে একটা উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত, সবুজ মানে তো জীবনের সব আনন্দের মেলান রঙ, ... এই শূন্যতা থেকে সুন্দর – একটা কালো অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল সবুজ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর দীর্ঘতম ব্রীজ বানাতে চাই।" জীবনভর শূন্যতা এবং সেই শূন্যতা থেকে অতিক্রমের চেষ্টা অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা 'মৃত্যুসংবাদ' নাটকে প্রকাশিত। সুতরাং তত্ত্বগত দিক থেকে অ্যাবসার্ড নাটকের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এ নাটক।

মোহিতের 'দ্বীপের রাজা' নাটক কিমিতিবাদের লক্ষণাক্রান্ত। এখানে নাট্যকার তার নিজস্ব ভাবনাকে স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্নের মাঝখানে স্থাপন করেছেন। বিবর্তনের নিরিখে পরিবর্তনকে দেখাতে চেয়েছেন। নাটকটির মুখবন্ধে নাটককারের কথাতেই এই বিবর্তনের রূপ প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় লেখেন যে অনেকটা কোন স্বপ্নের দুঃস্বপ্নে বদলে যাওয়ার মতো নাটকটির চরিত্র। কিংবা যুদ্ধের

মুখোমুখি এই পৃথিবীর পরিণামকে তিনি একটি সবুজ গাছের ক্রমশ ভৌতিক পাতাহীন শূন্যতায় রূপান্তরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাটকের পেপে নামের এক যুবক স্পেনের পালামোরিস গ্রামে টম্যাটোর খেতে প্রায় তরমুজের মত আয়তনের একটি হাইড্রোজেন বোমায় লাথি মেরেছিল। এর ফলে তার সমস্ত শরীর রেডিও একটিভ আক্টিভেট হয়ে যায়। সে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। এমনকি তার সংস্পর্শে যে আসে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা যায়। এই বোমার গায়ে লাথি মেরে নাটকের প্রধান চরিত্র সাগরের মনে হয়েছে যে সেই-ই রাজা কেন না ওই গোলাটার সে প্রথম লাথি মেরেছে। যার ফলে দ্বীপ বিষবৎ হয়ে যায়। যুদ্ধের বীভৎস রূপকে সরাসরি বিরোধিতা করে মানবতার জয়গান গাওয়ার অতি প্রচলিত পথে না গিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর নিষ্পত্র-বৃক্ষে রূপান্তরের মাধ্যমে ভাব ও রূপের যে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন।

বাস্তবতার প্রতীকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা মোহিতে চট্টোপাধ্যায়ের ‘ক্যাপ্টেন হুররা’ নাটকটি। নাটককার নিজস্ব ভরকেন্দ্রে থেকেই এ নাটকে অনেকখানি বাস্তবতার শর্ত মেনেছেন। এই নাটকের ঘটনা ঘটেছে ক্যাপ্টেন হুররা অধীনে একটি হোটেলে। হুররার কাছে হোটেলটি যেন একটি জাহাজ। জাহাজের মতো করেই হোটেলটি চালান বলে তিনি ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন হুররার জগৎ যেন এক রহস্যময় ধূসর জগৎ। তার সহকারি গুগলু। নাটকের শুরুতে হুররা আর গুগলু মিলে নাটকের যে বিচিত্র অসঙ্গতি- যে উদ্ভট এক আধা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে সৃষ্টি করেছিল তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সুনীল ও ইরার আগমনে। তারা হঠাৎ বাইরের পৃথিবী থেকে জাহাজে গিয়ে পড়ে তারা খোঁজে স্থবির জাহাজের বিপরীতে চলমানতাকে। নাটক শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন হুররা সব রহস্যের জাল ভেঙে যায়।

'বাইরের দরজা' (১৯৬৫) মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তি মনের অনুভব প্রধান নাটক গুলোর মধ্যে অন্যতম। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের গোপন ও অবচেতনে থাকা দৃশ্য এই নাটকে দেখিয়েছেন নাটককার মোহিত। এই নাটকে তরুণী মঞ্জু নির্জন রাতে মুখোমুখি হয়েছে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার। তার মনের মধ্য থেকে উঠে এসেছে নিহত কামনা ও পুরানো স্মৃতি জড়িত অবচেতন সত্তা। নাটকে যা ঘটেছে তা সবই তার মনোজগতের ঘটনা। তার মন বিশ্লিষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। মঞ্জুর প্রাক্তন প্রেমিক অশোক আর বর্তমান প্রেমিক কমল এই নাটকে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে। তারই সঙ্গে এসেছে বিবেকসদৃশ পাহারাওয়ালা চরিত্রটি। নাটকের কাহিনির অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অশোক বর্তমানে বেঁচে নেই। এক সময় অশোকের সঙ্গে কিশোরী বয়সে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল— হয়তো সেই তার প্রথম সম্পর্ক। তাই অশোক তার মনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মঞ্জু তাকে ভুলতে পারে না কোনোভাবে। এজন্যই মঞ্জুর মন তাকে তার বর্তমান প্রেমিক কমলের সামনে এনে হাজির করে। বোঝা যায় পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে মঞ্জুর মনের গভীর গহনে। বাস্তব মানুষ অনেক সময় ইচ্ছে মতো কোনো কিছু করে উঠতে পারে না। সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতি সততার প্রতীক হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটি ছিল পুরোটাই সচেতন মনের পরিচায়ক। একে ভিত্তি করে নাটককার গড়ে তুলেছেন পাহারাওয়ালা চরিত্রটি। এ হল সেই মানুষ যে সবার লুকোনো বাসনাকে পাহারা দিয়ে বেড়ায় সর্বদা। যাকে আমরা ভয় পাই। নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই সব। গোপনীয়তার আড়াল সরবার আগেই। তাই অশোক, কমল, মঞ্জু তিনজনই বস্তুত মঞ্জুর মনই পাহারাওয়ালাকে মনে করেছে তার পরম শত্রু। তাকে সে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কারণ মানুষের অবচেতন প্রায়শই সচেতন মনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, অসম্ভবের প্রতীকায়িত ব্যবহার এবং সাংকেতিকতার সমন্বয়ে এই নাটকে নাটককার ফ্যান্টাসির সাহায্যে অপরূপ জীবনোপলব্ধির কথা বলেছেন। 'বাইরের

দরজা' নাটকটির সঙ্গে ইয়োনেস্কোর 'আমেদি অর হাউ টু গেট রিড অফ ইট' নাটকের কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র ও সংলাপের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। দুটি নাটকেই ঘরের মধ্যে একটা মৃতদেহকে কেন্দ্র করে নাট্যক্রিয়া ঘনীভূত হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক উপাদান রয়েছে যেমন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া, পরস্পর সংযোগের অভাব, নিঃসঙ্গ নির্জন জীবন যন্ত্রণার পরিচয়, বিক্ষুব্ধ সমাজ সমালোচনা ব্ল্যাক হিউমারের প্রয়োগ প্রভৃতি যা নাটককের উদ্ভটত্বকে প্রকটিত করে তোলে।

'সোনার চাবি' (১৯৬৬) নাটকের নায়ক গৌতম একটি সোনার চাবি সে। তারপর থেকে সে খুঁজে যায় একটি বাক্স। যে বাক্স খোলা যাবে সোনার চাবি দিয়ে। আশ্চর্য সেই বাক্স যার মধ্যে আছে অকল্পনীয় দুর্লভ রত্ন সম্ভার। হঠাৎ এসে যায় সৌমেন্দু নামক চরিত্রটি। গৌতম এর প্রেমিকা নন্দিতার সহায়তা এবং কিছুটা সম্মোহনের দ্বারা বাক্সটা খুঁজতে চেষ্টা করে সে। যদিও গৌতম এতদিন নন্দিতার প্রেমকে গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু বাক্সটা পাওয়ার সম্ভাবনায় তার মনের মধ্যে বেজে ওঠে ভালোবাসার সুর। শেষ পর্যন্ত সেই সোনার চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেখা যায় আরেকটি চাবি। হয়তো মানুষের পরম কাম্যকে না পাওয়ার ইঙ্গিত নাট্যকার আমাদের দিয়েছেন নাটকের মাধ্যমে। পরম কাম্যকে কোনদিনও পাওয়া যায় না, তাকে কেবল খুঁজে যেতে হয়। সন্ধানের এই প্রয়াসই গৌতমকে উপলব্ধি করতে শেখায় যে বাক্সের ভেতর রাখা কোন জড় সামগ্রী নয় মানুষের আসল প্রয়োজন সেই বাক্স যার মধ্যে রয়েছে সহানুভূতি মমতা ও ভালোবাসা। ভালোবাসার মধ্যেই পাওয়া যায় পরম প্রাপ্তিকে। এক জটিল মনস্তত্ত্বের নাটক। লৌকিক অলৌকিতার মেলবন্ধনে, রূপক, ফ্যান্টাসির উপাদান নাটকটিতে প্রকটিত হয়েছে।

'গন্ধরাজ হাততালি' (১৯৬৬) এই নাটকটিতে মানুষের ভালোবাসা সংকট রূপায়িত হয়েছে। মানুষ একই সঙ্গে একাধিক জনকে ভালবাসতে পারে। ভালবাসা পেতেও পারে একাধিকজনের। মনের এই জটিল অবস্থানটি বিবৃত হয়েছে এই নাটকে।

নায়িকা মীরা মানসিক দিক থেকে ঈষৎ অসুস্থ। তাকে ভালোবাসে প্রতিবেশী অরুণ, হঠাৎ এসে পড়া হরিকিঙ্কর এবং প্রণব মিত্র। প্রণব মিত্র অবশ্য মীরাকে কৈশোর থেকেই ভালবাসে। প্রণব মিত্রের কাছে মীরার স্মৃতি রজনীগন্ধার সঙ্গে যুক্ত। প্রণব মিত্র চিঠিতে লিখেছে মীরার বয়স যখন চৌদ্দ-পনেরো। একদিন এক গাছা রজনীগন্ধার স্টিক হাতে নিয়ে মীরা ঘরে ঢুকেছিল। তার সাজপোশাকে ছিল জংলা রঙের শাড়ি, গোলাপি ব্লাউজ, দুধের মতো সাদা ফিতেয় বিনুনির শেষ প্রান্তে একটা ধবধবে ফুল। এভাবেই নাটকটিতে প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে যায় শুদ্ধতা রজনীগন্ধা ও গন্ধরাজ দুটি সুগন্ধযুক্ত সাদা ফুল। অবশ্য এখানে ব্যতিক্রম হয়ে ওঠে হরিকিংকর। কারণ তার প্রেম নানা রঙে রঙিন হয়ে ওঠে। সে নানা রঙের চশমা ব্যবহার করে ও মীরাকেও সেই চশমা উপহার দেয়। মীরা তার এই তিন প্রেমিককেই ভালোবাসে কিন্তু দেখা যায় শেষ পর্যন্ত অরুণই মীরার সঙ্গে থেকে যায়। প্রণব মিত্র ও হরিকিঙ্কর দুজনেই চলে গেলেও মীরার প্রেম থেকে তারা বঞ্চিত হয় না। মীরা অনুভব করে একা বিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। মানুষে মানুষে সংযোগে বেঁচে থাকার জন্য জরুরী আর প্রেমই সেই যোগ তৈরি করতে। ভালোবাসা অনেক সময়েই প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় না, তার কারণ সামাজিক পরিবেশ। গোপন প্রণয় মানুষকে অনেক সময় অসুস্থ ও বা অস্বাভাবিক করে তোলে। মীরার অসুস্থতার কারণ হয়ত অব্যক্ত বহুমুখী ভালবাসা। প্রেম যখনই ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ পায় তখনই যেন মানুষ হয়ে ওঠে স্বাভাবিক সহজ–সুস্থ। অবশ্য ত্রিকোণ প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বঘন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং কখনও কখনও তা অতিক্রম করে প্রেমই নিজস্ব দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। সেই প্রেমকেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রকৃত প্রেমরূপে তুলে ধরেছেন। যেখানে প্রেমের সম্পর্ক ঈর্ষায় পরিণত হয় না সেখানে প্রেম সহমর্মিতার সম্পর্কে উপনীত হয়। সিগ্ধ সুগন্ধ গন্ধরাজের মতোই তা বিকীর্ণ করে দেয় অসীম শক্তির অনুভব। এ নাটকে ব্যক্তিমনের ভালোবাসার সঙ্গেই প্রশান্ত মহিমার সন্ধান মেলে। নাটকটি ব্যক্তির পরিচয় ও পরিচয় হীনতার সমস্যাকে

কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আগন্তুক চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকেও। প্রণব আর হরকিঙ্কর এই দুটি আগন্তুক চরিত্র ছাড়া অরুণ এবং মীরা এই চারটি চরিত্রের আলাদা আলাদা সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটি রিলেশন একটা আইডিয়া। মহাযুদ্ধের মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত রাষ্ট্র সমাজ ব্যক্তি ক্ষণভঙ্গুর। যুদ্ধ সভ্যতাকে ধ্বংস করে, শান্তি ও প্রেম সভ্যতাকে গড়ে তোলে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা। গন্ধরাজের হাততালি হল এই ভালোবাসার দ্যোতনা। নাটকের চরিত্রগুলি প্রতীকী দ্যোতনায় উজ্জ্বল। নাটকটিতে অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ অতিমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও এ নাটক অ্যাবসার্ড দর্শনকে অতিক্রম করে আলাদা ইঙ্গিত ফুটিয়ে তোলে। এদিক থেকে নাটকটিকে সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের নাটক বলে অভিহিত করা যায়।

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে ‘বহুরূপী ২৫’ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায় এর অপর একটি নাটক ‘চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড’ রূপকধর্মী। নাটকটি ‘মৃত্যুসংবাদ’ নাটকের দ্বিতীয় পর্ব বলে পরিচিত। জিরাদ্যু প্রণীত ‘দ্য এনচ্যান্টেড’ নাটকের অনুসৃজন। তিন অঙ্কের এই নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে এক প্রেত ও স্কুল শিক্ষিকা শান্তা লাহিড়ী। বিষয়বস্তু রয়েছে- এককালের জমিদার মল্লিকদের হলঘরে প্রেতকে ধরার জন্য শহরের সমাজপতিদের নিয়ে সভা বসে। পুলিশ ইন্সপেক্টর, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান চৌধুরী, ডাক্তার ও মল্লিকদের ছোটছেলে সভায় আলোচনা করে শহরে আবির্ভূত একটি প্রেতকে নিয়ে। সেই প্রেতটি অভিশপ্ত, তাকে নিধন করতে হবে এই তাদের যুক্তি। কিন্তু শান্তা লাহিড়ী প্রেতটির মনে ভালোবাসার বীজ রোপন করতে চায়। তার বাঁচবার আগ্রহ তৈরি করতে চায়। তাকে পুনরায় স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মানুষ করে তুলতে চায়। শান্তার এই কাজে আপত্তি রয়েছে সমাজপতিদের। তারা মনে করে প্রেতের সঙ্গে স্কুল শিক্ষিকার রহস্যজনক প্রেমালাপ ক্ষতি করছে সমাজের ও স্কুলের। শান্তা স্কুলে ঠিকমতো শিক্ষাদান করছে কিনা সে

বিষয়েও তারা সংশয় প্রকাশ করে। সবাই চলে যেতে শান্তা প্রেতকে হলঘরে নিয়ে আসে। প্রেতের হলঘর সহ্য হয় না, মনে হয় দেয়ালগুলো তাকে পিষে মারতে চাইছে। শান্তা তাকে অন্ধকার থেকে আলোর উৎস আনতে চায়। অন্যদিকে মল্লিক চরিত্রটি শূন্য খাঁচায় পাখি পুষতে চায়। ইন্সপেক্টর স্বপ্নকে ক্যান্সারের মতো অসুখ বলে মনে করে। তারা অদ্ভুত ও উদ্ভট স্বপ্ন দেখে। সরকারের উচ্চ বিভাগ থেকে প্রেত সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ইন্সপেক্টর দুজন গানম্যানকে নিয়োগ করে প্রেতকে মারার জন্য দুজনেই নৃশংস রোবটের মতো। এদিকে প্রেত শান্তার স্পর্শে বেঁচে উঠতে থাকে। তার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে ইন্সপেক্টর চৌধুরী, স্পাই রাধাগোবিন্দ, গানম্যানরা। তারা অলৌকিককে মারতে চায়। শান্তাকে ভালোবাসে মল্লিক। সে বলে সেও প্রেত, প্রেতের মতই অতীতকে নিয়ে বাঁচতে চায়। তাই সে শান্তাকে চায়। এদিকে প্রেত শান্তার ভালোবাসা বেঁচে উঠছে, সে বলে হাজার হাজার প্রেত জীবন ফিরে পেতে চায়। বাড়ির ভিতর লুকিয়ে থাকা গানম্যানরা ইন্সপেক্টরের নির্দেশে গুলি চালিয়ে হত্যা করে প্রেতকে। শান্তা কেঁদে ওঠে। মল্লিক খাঁচায় বন্দী টিয়াকে ছেড়ে দিতে চায়। চৌধুরী দুঃস্বপ্নে ভোগে। শেষ পর্যন্ত ইন্সপেক্টরের ঘরটাকে মনে হয় খাঁচা, আর খাঁচার মধ্যে সে একাকী। অদ্ভুত অন্ধকারে ঢেকে যায়। আলোর জন্য আর্তনাদ করতে থাকে। এভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নাটকটিতে অভিনব আঙ্গিকে রূপক প্রতীকের ব্যঞ্জনায় শূন্যতা থেকে সবুজময়তায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবেদ পরিবেশিত। শাসক শক্তির শৃঙ্খলার যূপকাষ্ঠে ভালোবাসার মুল্যহীনতা প্রতিভাত হয়। এখানে প্রেত অর্থে অতীত, নিষ্পেষিত, পর্যুদস্ত মানুষের রূপক। যে বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজে পায় না। হতাশা বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা-কাতরতার, যন্ত্রণার অন্ধকারে নিমজ্জিত সে প্রেতের আচরণ করে।। মুক্তির, স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার আলো তার কাছে পৌঁছায় না। এই কারণে তার অস্তিত্বের সংকট প্রকটিত হয়। সে ডুবে যায় আরো গভীর অন্ধকারে, এমনকি নিজের শরীরটাকে ছায়ামাত্র ভাবে।

প্রেতাত্মা শরীরে বেঁচে থাকার হাতিয়ার হলেন শান্তা লাহিড়ী। শান্তা চরিত্রটি এখানে ভালবাসার আলোকবর্তিকা স্বরূপ, জীবনের আশার- বেঁচে থাকার আলো 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'। যেন জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো শান্তির নীড়। শান্তার দ্বারাই শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে প্রেতকে আনার চেষ্টা। প্রেত শান্তাকে বলে 'তুমি তোমার মন, মনের ভেতরের আলো; চোখ; চোখের ভেতরের আলো, চিবুক, চিবুকের চারপাশের আলো। তুমি কেবল আলো, আলো আর আলো।' আলোই দূর করতে পারে প্রেতের মনের অন্ধকার। প্রেত খুশির জোয়ারে ভেসে বলেছে- 'শান্তা তুমি এত সুন্দর কেন, আমার হাত-পা তারের মতো বেজে উঠছে কেন? শান্তা সুখ কাকে বলে আমার মনে পড়ছে, উল্লাস মনে পড়ছে, দুঃখ মনে পড়ছে।'

এ নাটক উদ্ভটের লক্ষণ রয়েছে। নাটকের অন্যান্য চরিত্ররা যে স্বপ্ন দেখে তাতে উদ্ভটের আভাস পাওয়া যায়। ইন্সপেক্টর স্বপ্ন দেখে চাঁদটাকে কবর দিচ্ছে আর তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা আলো তীরের মত তাড়া করছে তাকে। চৌধুরী স্বপ্ন দেখে একটা বিশাল ঘড়ি থেকে পেন্ডুলাম ছিটকে এসে তাড়া করছে তাকে। ডাক্তারও দেখে, সে স্বপ্নে হাত লেগে সুতো ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি কোথায় ভেসে যায়। এই সকল স্বপ্ন চরিত্রগুলির মনোবিকলনের ফল। অ্যাবসার্ড নাটকের শূন্যতার দর্শন এখানে রয়েছে। ভয়াবহ শূন্যতাবোধ তার নিদর্শন তবে। এখানে শূন্যতায় জীবনের শেষ এই ইঙ্গিত নেই বরং তার সবুজের দিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাটককার। এখানে প্রেত চরিত্রটি অ্যাবসার্ড আদর্শ অতিক্রম করলেও ঘড়িতে তেরোটার ঘণ্টা বাজা অ্যাবসার্ডের লক্ষণ কিংবা ঘড়ির পেণ্ডুলাম ছিটকে আসা উদ্ভটের লক্ষণ। সংলাপেও অ্যাবসার্ড বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় নাটক 'নীলরঙের ঘোড়া' নাটকের সোমনাথ চরিত্রের যে সংকট, 'ব্ল্যাক আউট অফ কমিউনিকেশন' এই সমস্যাকে আরও একভাবে পাওয়া যায় 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকে। আসলে মোহিত চট্টোপাধ্যায় 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' নাটকটিতে রূপক-প্রতীকের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার

গোলাপ ফোটাতে চেয়েছেন। তিনি সম্পর্কে তাঁর মতের সমর্থনে বলা যায় আবসার্ড হতাশাব্যঞ্জ পরিণামকে শুভ ও সুন্দরের দিকে করলে এই ধরনের নাটক থেকে মূল্যবান কিছু মিলতে পারে। 'মৃত্যুসংবাদ' ও 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, নাটক দুটিতে নাটককার সেই শুভ পরিণামের কথাই বলতে চেয়েছেন। আর এ কারণেই তাঁর নাটকের অ্যাবসার্ড দর্শনকে অতিক্রম করে ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।

১৯৭৩ সালে 'বর্ণপরিচয়' নাটকটি প্রকাশিত একটিমাত্র দৃশ্যে পাঁচটি চরিত্র নিয়ে এই নাটকের কাহিনির অগ্রগতি। নাটকের বিষয়বস্তু দেখা যায় দিশেহারা চারজান মানুষ নিষ্প্রদীপ পার্কের একটা ল্যাম্পপোস্টকে কেন্দ্র করে কেবল নিজেদের পরিচয় হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে। হিজ হাইনেস নামক চরিত্রটির কেবল হাইতুলে তার জীবন কেটে যায়। বোমকেশ নামের বোম আর কেস উচ্চারণ থাকায় পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেতে সে পালিয়ে বেড়ায়। স্মাগলার চরিত্রটি ছোটবেলার আর একজন অমলিন ছবিকে বুকে করে স্মাগলিং করে। ক্লাউন চরিত্রটি ক্যাসেট বাজিয়ে শিক্ষকতা। এই ক্লাউন চরিত্রটির দ্বারা প্রথম বর্ণ বিপর্যয়ের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্ণের বিপর্যয় ঘটেছে। আমাদের কথা বলায়, আমাদের পা ফেলার ভাষায়, লড়াই ও হাই তুলবার ভাষায়। মানুষের মুক্ত বিবেকের প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয় ছেলে চরিত্রটি। তার সাহায্যে মানুষ বর্তমান সমাজের বর্ণ বিপর্যয় রোধের আশা প্রকাশ করেছেন নাটককার। বর্ণবিপর্যয় এখানে সভ্যতার বিপর্যয়ের প্রতীকে রূপায়িত। উদ্ভটধর্মী এই নাটকের আঙ্গিকে জটিল জীবন যন্ত্রণা ও তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। হাস্য - পরিহাস, রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-কৌতুকের মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিপর্যয়কে দেখিয়েছেন নাটককার। জীবনের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো নাটকের উদ্ভটধর্মীতাকে প্রকট করে তোলে। একটি ল্যাম্পপোস্টকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ানো আবার বিপরীত দিক থেকে গইত পরিবর্তন করে সেই চক্রাকারে ঘোরা এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ার মধ্যে নিষ্ফল কর্মহীন জীবনকে রূপকায়িত করে যা অভিশপ্ত সিসিফাসের জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

চরিত্রগুলি বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, এবং লস্টনেসে আক্রান্ত। এছাড়া সময়ের নিরিখে মানুষের সত্তা ক্রমশ পাল্টে যাওয়া অ্যাবসার্ড লক্ষণাক্রান্ত। নাটকটিতে পৃথিবীর জটিল অবস্থা থেকে ইতিবাচক সামাজিক উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন নাটককার। 'বর্ণ বিপর্যয়' নাটকে অ্যাবসার্ড বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

'হীরামন' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা অংশের 'ব্ল্যাক কমেডি'র কথা বলেছেন। 'Black Comedy' শব্দটি 'Comedie noire' শব্দ থেকে translation করা হয়েছে। যার প্রথম ব্যবহার রয়েছে Jean Anouilh (1910–80)-র নাটকগুলিতে। এছাড়া Andre Breton - এর 'Anthologia de I'human noire'(1940) তে black comedy-র ব্যবহার রয়েছে। ব্ল্যাক কমেডি প্রসঙ্গে J.A. Cudden তাঁর 'The Penguin Dictionary of Literary Terms & Literary Theory' গ্রন্থে বলেছেন — "Black comedy is a form of drama which display a marked disillusionment and cynicism. It shows human beings without convictions and with little hope, regulated by fate or fortune or incomprehensible powers. In fact human beings in an absurd predicment. At its darkest such comedy perveded by a kind of sour despair, we can't do anything, so we may as we laugh. The wit is mordant and the humour sordonic.

This form of drama has no easily perceptible ancestry, unless it be tragi comedy (q.v.) and so called 'dark'."

আবার M.H. Abrams and Geoffrey Galt Harphan সম্পাদিত 'A Handbook of Literary Terms' রয়েছে — " The early plays of Tom Stoppers, such as Rosencrantz and Guildenstern are Dead (1966) and

Travesties (1974) exploit devices of absurdist theatre more for comic than philosophical ends. There are also affinities with this movement in the numerous recent works which exploit black comedy or black humour, beleful movie or incept characters in a fantastic or nightmarish modern world play out of their role in what. Ionesco called a 'tragic farce' in which the event are often stimultaneously comic, horrifying and absurd."[৪৬]

ব্ল্যাক কমেডি নাটক প্রসঙ্গে বলা যায়— মৃত্যু রুগ্নতা যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে তিক্ত ও উদ্ভট বিনোদনমূলক এক ধরনের ব্ল্যাক হিউমার গড়ে তোলা প্রহসন ধর্মী নাটক বা অন্যান্য রচনাকে ব্ল্যাক কমেডি বলে চিহ্নিত করা যায়। পাশ্চাত্যের বহু নাট্যকার তাঁদের নাটকে কমেডি প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। শম্ভু মিত্র তাঁর নিজের নাটককে 'কৃষ্ণ কৌতুকীয়' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর দুটি নাটক 'গর্ভবতী বর্তমান' ও 'অতুলনীয় সম্বাদ'-এ ব্ল্যাক কমেডির প্রয়োগ রয়েছে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'হীরামন' নাটকে ব্ল্যাক কমেডির উপাদান বর্তমান। নাটকের বিষয়বস্তুতে রয়েছে অর্থ বৃদ্ধ পঙ্গু জেঠু নামক চরিত্র তার দুঃস্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে আত্মীয় স্বজন হারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ একাকী শুভকে নিজের শাসনাধীনে প্রতিপালন করে। জেঠু নিজেকে একজন ডিক্টেটর মনে করেন। তার সাম্রাজ্যের একমাত্র প্রজা শুভ। সারা নাটক জুড়ে জেঠু ও শুভর প্রভুত্ব এবং দাসত্বের এবং তাদের অন্ধ আনুগত্য আদায়ের চূড়ান্ত দাবির খেলা সংঘটিত হয়। এই আনুগত্য আদায়ের নিদর্শন হৃদয়বিদারক, অপমানকর, অমানবিক, নিষ্ঠুর-নির্মম যা পাঠক-দর্শক সমাজে কৌতুককর ও বিষাদময় হয়ে ওঠে। এছাড়া রুগ্নতা, হত্যা, মৃত্যু ইত্যাদির দ্বারা 'হীরামন' নাটকের বিষয়বস্তুতে এক ধরনের উদ্ভট বিনোদন- ব্ল্যাক হিউমার গড়ে তোলা হয়েছে। যে আত্ম

অনুসন্ধানের অদম্য স্পৃহায় নাটককার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে পথ চলা শুরু হয়েছিল। 'রাজরক্ত' নাটক রচনার মধ্য দিয়ে সে পথের দিক ঘটে যায়। তাঁর নাটকের পর্বান্তর শুরু হয়। প্রথম পর্বের নাটকের মধ্যেই তত্ত্ব ভাবনার গুরুত্ব অধিক মাত্রায়। তিনি তাঁর 'রাজরক্ত' অ্যাবসার্ডিটির আঙ্গিকে রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এমন বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন যেখানে গণনাট্যের ভাবনাও প্রতিফলিত। 'রাজরক্ত' পরবর্তী পর্বান্তরের নাটকগুলির আঙ্গিক রচনার ক্ষেত্রে মোহিত চট্টোপাধায় প্রথম পর্বের কিমিতিবাদী প্রকরণ থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছেন অনেকখানি। পরবর্তী পর্বে রচিত নাটকগুলিতে রাজনৈতিক মাত্রা প্রাধান্য লাভ করে। এই সময় তিনি রচনা করেছেন 'মহাকালীর বাচ্চা', 'স্বদেশী নকসা', 'কানামাছি খেলা'র মতো নাটক। এছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিন্যাস, জটিলতা, ভাঙন প্রভৃতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক নাটক রচনা করেছেন যেমন- 'রিঙ', ফিনিক্স', বাজপাখি', 'সোনার চাবি' প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র

১। মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়; নভেম্বর, ২০১১, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা- ৮৯; পৃষ্ঠা - ২০।

২। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ৮।

৩। Esslin, Martin : The Theatre of the Absurd; Third Edition ; Reprinted 2004, Methun Publishing Limited, London SWIV IEJ ; In India, Chennai 600029; Page - 23।

৪। Ibid, Page – 22 - 23 ।

৫। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা – ৭ - ৮।

৬। মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়; নভেম্বর, ২০১১, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা- ৮৯; পৃষ্ঠা - ১৪।

৭। তদেব।

৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩।

৯। মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর : নাট্যতত্ত্ব-বিচার, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা-৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ২৭৬।

১০। মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়; নভেম্বর, ২০১১, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা - ৮৯; পৃষ্ঠা - ১৪।

১১। মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর : নাট্যতত্ত্ব-বিচার, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা - ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ২৭৭।

১২। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ১৩ ।

১৩। সরকার, পবিত্র : নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, মার্চ ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০০৭৩, পৃষ্ঠা – ১৩৭ - ১৩৮।

১৪। তদেব।

১৫ ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ১৭ - ১৮ ।

১৬। তদেব।

১৭। মিত্র, কুন্তল : অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়; নভেম্বর, ২০১১, অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা - ৮৯; পৃষ্ঠা - ১৪।

১৮। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ; জানুয়ারি ২০১০, নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন কলকাতা - ৭০০০১৪, পৃষ্ঠা - ৪১।

১৯। তদেব।

২০। তদেব।

২১। তদেব।

২২। http//www.encyclopedia.com

২৩। http//www.encyclopedia.com

২৪। Cuddon, J. A. : Dictionary of literary terms and Literary Theory (Fourth Edition), 1998, Black Well Publishers Ltd. Page - 368 ।

২৫। http//www.encyclopedia.com

২৬। http//www.encyclopedia.com

২৭। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা – ১২ - ১৩।

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩।

২৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, বৈশাখ ১৩৬৮, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩ , পৃষ্ঠা – ৬৮২।

৩০। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ১৪।

৩১। দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলের ৩০ বছর; জানুয়ারি, ১৯৮৭; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা - ৯, পৃষ্ঠা - ২১৫।

৩২। মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর : নাট্যতত্ত্ব-বিচার, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা - ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ২৮১।

৩৩। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : 'আমার নাটক লেখা', রঙ্গপট নাট্যপত্র, ডা. তপনজ্যোতি দাস (সম্পাদক), ২০১২, পৃষ্ঠা – ৮২।

৩৪। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : নাটক সমগ্র (ভূমিকা অংশ – কুমার রায়), ২০০১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭৩, পৃষ্ঠা - ১০।

৩৫। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : 'আমার নাটক লেখা', রঙ্গপট নাট্যপত্র, ডা. তপনজ্যোতি দাস (সম্পাদক), ২০১২, পৃষ্ঠা – ৮৩।

৩৬। সেন, নবেন্দু : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, রত্নাবলী, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা - ৩১১।

৩৭। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : 'আমার নাটক লেখা', রঙ্গপট নাট্যপত্র, ডা. তপনজ্যোতি দাস (সম্পাদক), ২০১২, পৃষ্ঠা – ৮৩।

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা – ২৭ ।

৩৯। সেন, নবেন্দু : পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, রত্নাবলী, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা - ২১১।

৪০। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : 'আমার নাটক লেখা', রঙ্গপট নাট্যপত্র, ডা. তপনজ্যোতি দাস (সম্পাদক), ২০১২, পৃষ্ঠা – ৮৩।

৪১। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ১৩৭ ।

৪২। তদেব।

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৮।

৪৪। চট্টোপাধ্যায়, মোহিত : অ্যাবসার্ড নাটক ও মৃত্যুসংবাদ', প্রমা নাট্যপত্র, শুভঙ্কর রায় (অতিথি সম্পাদক), ২০১২, পৃষ্ঠা – ১৩।

৪৫। ঘোষ, ড. অরূপরতন : বাংলা অ্যাবসার্ড থিয়েটার ; একটি অন্য শতাব্দীর চিত্রকল্প প্রকাশনা; জানুয়ারি ২০০৩; পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ; পৃষ্ঠা - ৯ ।

৪৬। Cuddon, J. A. : Dictionary of literary terms and Literary Theory (Fourth Edition), 1998, Black Well Publishers Ltd. Page - 87 ।